কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

এপ্রিল ৮৩

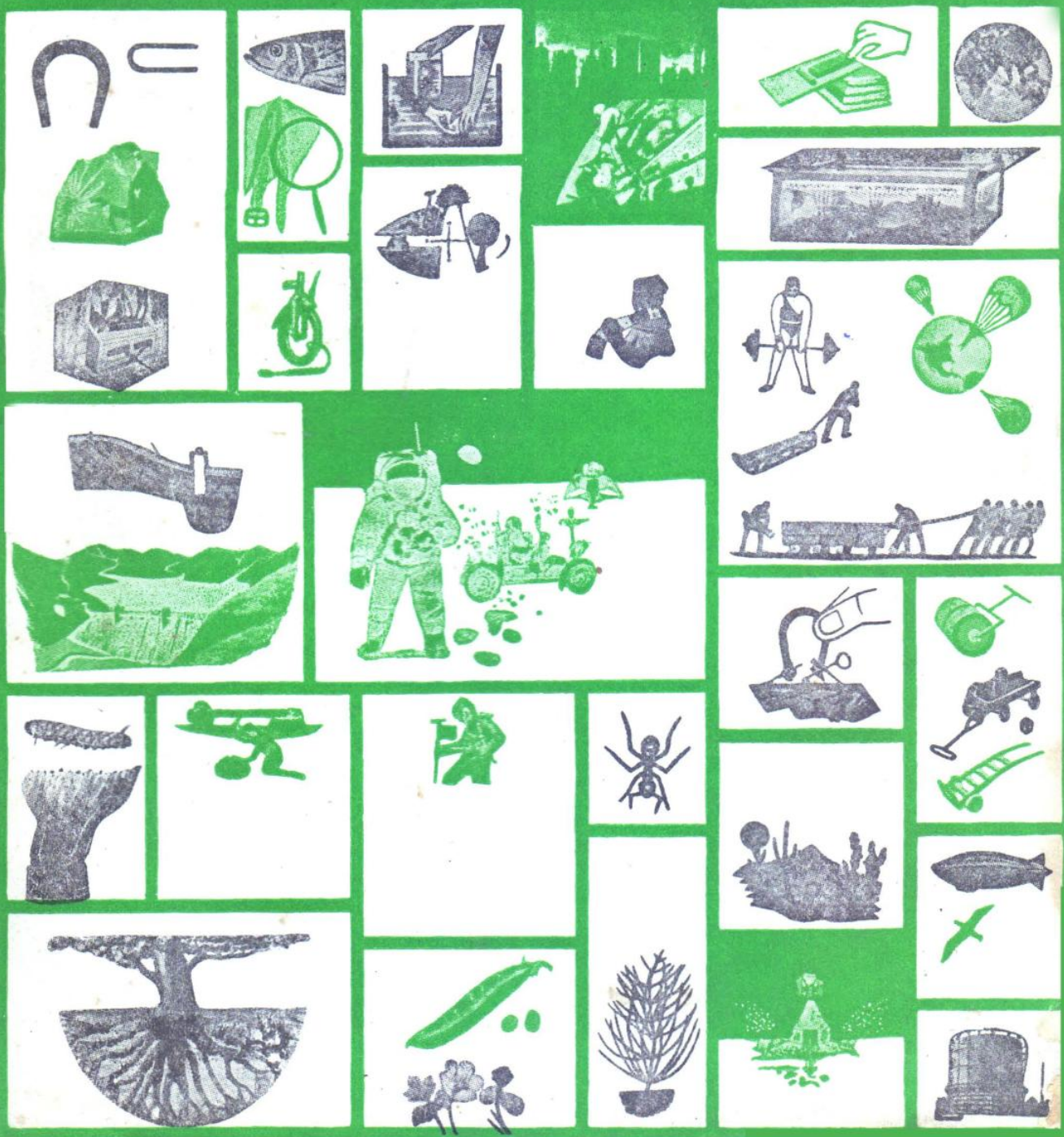

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

জুলে ভার্নে-র টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

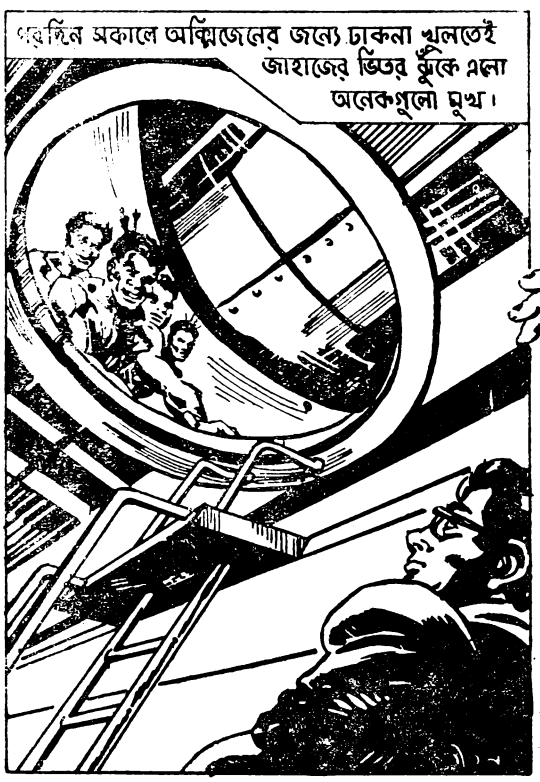

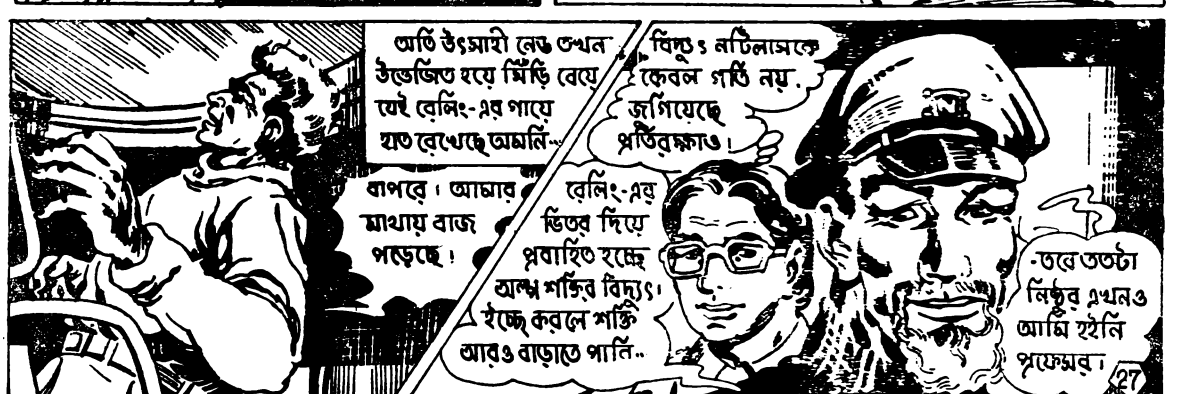

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

2য় বর্ষ 12ম সংখ্যা ॥ 1983

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

এই সংখ্যার সঙ্গে 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হলো। আগামী সংখ্যা থেকে তৃতীয় বর্ষ শুরু হবে। কিশোরদের উপযোগী সম্পূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক একটি পত্রিকা সাফল্যের সঙ্গে দুটি বছর অতিক্রম করেছে—এটা কম আনন্দের কথা নয়। শুধু নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হওয়া নয়, এই পত্রিকা কিশোরদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে উত্তরোত্তর আগ্রহ ও উৎসাহ সঞ্চার করতে সমর্থও হয়েছে।

নতুন বছরে আমরা পত্রিকাটিকে তোমাদের কাছে আরও আকর্ষণীয়, শোভন ও সুন্দর করে তুলতে চাই। এজন্যে আমরা কিছু পরিকল্পনা করেছি। তোমাদের কাছেও এবিষয়ে অভিমত চাইছি। নতুন কি কি বিষয় সংযোজিত হলে পত্রিকা আরও আকর্ষণীয় হতে পারে তা আমাদের লিখে জানিও।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1
চিঠিপত্র 2

দপ্তর থেকে
মহাবিশ্ব কি বাড়ছে ? ॥ সমরজিৎ কর 4
বিজ্ঞান-সংবাদ 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প
স্কন্ধকাটার কিনারা ॥ জীবন ভৌমিক 9

পড়াশোনা
জীবন-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ ॥ তারকমোহন দাস 21
নিত্যব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্য ॥ অমরনাথ রায় 15
সমীকরণ সমাধানের সহজ পদ্ধতি ॥ নন্দলাল মাইতি 25

ছবিতে গল্প
জুলেভার্নের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী ॥
গৌতম কর্মকার : প্রচ্ছদ 2, 3
ছবির মজা ॥ প্রণব হোড় 36
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 24
আধুনিক গান না মৃত্যুবাণ ? ॥ উজ্জ্বল ধর 28

পশুপাখীর গল্প
নীলকণ্ঠ পাখিদের কথা ॥ অজয় হোম 18
হলুদ সন্ন্যাসিনী ॥ নারায়ণচন্দ্র চন্দ 47

উপন্যাস
অল ইণ্ডিয়া কমন পিপ্‌লস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ॥
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 33

জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
আমরা স্বপ্ন দেখি কেন ? ॥ জয়ন্ত সুকুল 6
মশলার একাল-সেকাল ॥ অসিতবরণ মণ্ডল 12
লোহা ভারি, না তুলো ? ॥ অরূপরতন ভট্টাচার্য 30
কার দৌড় কত ? ॥ অলোককুমার সেন 31
দশমিকের জন্ম ॥ সাধনকুমার গিরি 32
সৌরমণ্ডলের টুকিটাকি ॥ বিমান বসু 37
রেফ্রিজারেটর ॥ অরুণকুমার মৈত্র 41
বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ॥ সুনির্মল রায় 43
পতনশীল বস্তু ওজনশূন্য ॥ দেবাশিষ জানা 44
বিজ্ঞানের টুকিটাকি ॥ ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল 29

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
টমাস আলভা এডিসন ॥ পথিক মণ্ডল 14

আবিষ্কারের গল্প
পোলিও রোগের আবিষ্কার কাহিনী ॥
নির্মলকান্তি ঘোষ 45

ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম 49
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তর 50 : প্রশ্নোত্তর 50
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসা 50
শব্দকূট ॥ দেবাশিস কর 51
বৈদ্যুতিক মডেল ॥ দেশকল্যাণ চৌধুরী 52
ভেবে ভেবে বল ॥ শুভব্রত রায়চৌধুরী 53
জানা-অজানা ॥ স্বপনকুমার মজুমদার 54
ভাবনা ॥ অনির্বাণ চক্রবর্তী 54
হাবুলের বিজ্ঞানভাবনা ॥ ধীরেন বল 56

চিঠিপত্র

প্রসঙ্গ ঃ মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা-83

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকার জানুয়ারী 83 সংখ্যায় প্রকাশিত মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী থেকে এ বছর (1983) মাধ্যমিক পরীক্ষায় 85·71% কমন এসেছে। হিসাব এই সঙ্গে দিলাম।

প্রণয় দত্ত ও উৎপল দে, দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে বয়েজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খড়্গপুর।

মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রশ্ন নম্বর	'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে' প্রকাশিত সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর নম্বর	প্রশ্নের মান যেগুলি কমন এসেছে
2 (ক)	3 b এর (ক)	2
2 (খ)	3 b ,, (ঘ)	6
2 অথবার (ক)	2 b ,, (ঘ)	2
2 ,, (গ)	2 b ,, (ঙ)	8
3 (ক)	3 b ,, (গ)	5
4 (ক)	7 a ,, (ঙ)	2
5 (ক)	10 (ক)	2
5 (খ)	10 (ঘ)	5
6 (ক)	12 (ঘ, ঙ)	5
8 (গ)	15 (গ, ঘ)	5
9 (ক)	1 (ক)	1
9 (খ)	1 (ছ)	4
9 (গ)	1 (চ)	1
11 (ক)	4 a-এর (ক)	2
11 (খ)	4 a ,, (গ)	5
12 (ক)	17 (iv)	2
12 (গ)	9 a-এর (ক)	1
13 (ক)	2 b ,, (গ)	2
	মোট—	60

নম্বরের মধ্যে কিঃ জ্ঞাঃ বিঃ প্রকাশিত সাজেসানে কমন 60নং অর্থাৎ 85.71%

প্রসঙ্গ ঃ মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা-83

ফেব্রুয়ারী 83 সংখ্যার 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রদত্ত ভৌতবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী থেকে এ বছরের (1983) মাধ্যমিক পরীক্ষায় 75·0% কমন এসেছে। নিচে হিসাব উল্লেখ করলাম।

ময়ূখ চৌধুরী, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, 1983, এন্. বি. টি 34A নিউট্রাফিক, খড়্গপুর।

মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রশ্ন নম্বর	কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর নম্বর	প্রশ্নের মান যেগুলি কমন এসেছে
1 1 a	4 (ক)	3
2 1 b	4 (খ)	2
3 1 d	4 (ঙ)	2
4 2 a	3 (ক)	4
5 2 b	3 (খ)	2
6 3 a	1 (ঙ)	3
7 3 b	2 (গ)	1
8 3 c	3 (গ)	2
9 4 a	5 (গ)	2
10 4b	6 (গ)	1
11 4 c 1	5 (খ)	1
12 5 a	7 (ক)	2
13 5 c	7 (খ)	2
14 6 d	8 (ক)	2
15 7 c	8 (খ)	2
16 8 a	9 (ঙ)	3
17 8b	10 (খ)	2
18 8 c	10 (ক)	3
19 9 a	9 (ক)	4
20 9 b	9 (খ)	2
21 10 b	12 (ক)	2
22 10 c	11 (ক)	3
23 11 c	15 (খ)	2
24 11 d	14 (গ)	2
25 12 d	11 (ঙ)	$\frac{1}{2}$
26 13 b 1	16 (ঙ)	3
27 14 a	16 (ক)	3
28 14 c	15 (ক)	2
29 15 a	17 (খ)	1
30 15 b	17 (খ)	2
31 15 c	16 (ঙ)	2

মোট—67.5

90 নম্বরের মধ্যে 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান-এ প্রকাশিত' সাজেসনে কমন 67·5 অর্থাৎ 75%

দপ্তর থেকে

মহাবিশ্ব কি বাড়ছে ?

সমরজিৎ কর

কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে তৈরি এক একটি ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্ব। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় গ্যালক্সি। বহু-সংখ্যক বিশ্ব নিয়ে তৈরী মহাবিশ্ব। মজার ব্যাপার এই, এই মহাবিশ্বের আয়তন প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। বেড়েই চলেছে। এভাবে কতকাল চলবে তার হিসেব মেলা ভার।

কথাটা শুনে অবাক হচ্ছ তো ?

তা হলে গোড়া থেকেই বলি।

সেটা 1912 সাল। অ্যারাইজোনার লোয়েল মান মন্দিরে বসে দূর আকাশের নক্ষত্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতি-বিধি লক্ষ্য করেছিলনে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভেস্তো মেলভিন স্লিফার। তিনি তো অবাক! একি কাণ্ড! বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ বা গ্যালাকসি কেমন যেন আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না ? স্লিফারের তাই তো মনে হলো।

এই ঘটনার কথা শুনে জোতির্বিজ্ঞানীরা কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা চোখে পড়লো। জ্যোতির্বিজ্ঞানী এইডুন পি. হুবল-এরও। তিনি দেখলেন, স্লিফার যা বলেছেন তাতে কোনো ভুল নেই। 1929 সালে তিনি আবিষ্কার করলেন, শুধু আমাদের থেকেই গ্যালকসিগুলি দূরে সরে যাচ্ছে এটা ঠিক নয়। মহাবিশ্বের সমস্ত গ্যালাকসি বা নক্ষত্রপুঞ্জ পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের কাছাকাছি অঞ্চলের গ্যালাকসিগুলির গতি তুলনায় কম। কিন্তু যে সব গ্যালাকসি বা নক্ষত্রপুঞ্জ সুদূরবর্তী তাদের কারোর কারোর গতি আলোর গতির সমান। অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

অবাক হওয়ারই মত। 1920 সালের পর এ পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আর ওই সব নক্ষত্রপুঞ্জ বা গ্যালাকসির এক একটির মধ্যে বাস করছে দশ হাজার কোটি নক্ষত্র। এক একটি নক্ষত্র পুঞ্জ একটি নির্দিষ্ট অক্ষের চারপাশে প্রচণ্ড বেগে আবর্তন করছে। যেমন আবর্তন করে আমাদের সূর্য অথবা পৃথিবী। কিন্তু সেই সঙ্গে সবাই তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে —দূরে—আরো দূরে। অদ্ভুত মনে হয় না ?

ব্যাপারটা এইভাবে কল্পনা করঃ ধরো একটি বেলুন। কালি দিয়ে বেলুনটির গায়ে আঁকলে ছোট ছোট ফোঁটা। এবার বেলুনটি ফোলাতে শুরু করো। বেলুনটি ধীরে ধীরে ফুলছে। আর লক্ষ করো, ফোঁটাগুলি কেমন দূরে সরে যাচ্ছে। ধরো, ওই বেলুনটি যেন মহাবিশ্ব। আর ফোঁটা-গুলি এক একটি নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাকসি। তারা সবাই চলমান।

এবার বেলুনটির উপরকার যে কোন একটি ফোঁটা বেছে নাও। ধরো সেটা একটি স্থির বিন্দু। তার উপর দাঁড়িয়ে তুমি আর সব কিছুর দিকে চেয়ে রয়েছ। কি দেখবে তখন ? তোমার মনে হবে, আর সব বিন্দু তোমার কাছ থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। কাছের বিন্দুগুলি সরছে ধীর গতিতে। দূরের বিন্দুগুলির গতি অপেক্ষাকৃত বেশি।

আমাদের মহাবিশ্বের অবস্থাও যেন ওই বেলুনেরই মতো। ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে যেমন বেলুনের আয়তন বাড়ে, ঠিক তেমনি এই মহাবিশ্বও প্রচণ্ড এক শক্তির প্রভাবে নিয়ত আয়তনে বাড়ছে, ক্রমেই বাড়ছে।

জিজ্ঞেস করবে হয়তো, এই বাড়ার ব্যাপারটা কবে শুরু হয়েছিল ? যে শক্তি মহাবিশ্বের আয়তন বৃদ্ধি করছে তার উৎসই বা কী ?

উত্তরটা সংক্ষেপে এইরকমঃ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ শুরু হয়েছিল আজ থেকে এক হাজার কোটি বছর আগে। আজকের মতো মহাবিশ্বে তখন কোন গ্রহ, উপগ্রহ অথবা নক্ষত্র ছিল না। আলোক রশ্মির মত শক্তি আর উত্তপ্ত গ্যাস এই নিয়ে মহাবিশ্ব। গ্যাসের উপাদান বলতে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস বা প্রোটন, হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রন কণা। তারা তৈরি

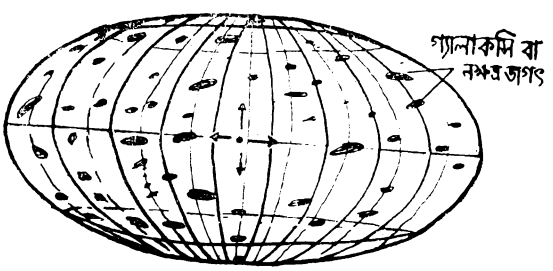

করে রেখেছে অতিকায় অগ্নিকুণ্ডের মতো বিশাল এক বস্তু। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে যে পথটি ধরে ঘুরছে, তার ব্যাস আঠারো কোটি ষাট লক্ষ মাইলের মতো। সেই বিশাল বস্তুটির ব্যাসও ছিল প্রায় পৃথিবীর পরিক্রমণ

পথের এই ব্যাসেরই প্রায় সমান। সেই বস্তুতে ঘটল বিস্ফোরণ। তখন তার তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়ালো কয়েক হাজার কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই বিস্ফোরণের নাম দিয়েছেন 'বিগ্ ব্যাংগ।' বিস্ফোরণের পর বিশাল সেই বস্তুটি ভেঙ্গে যায়। তার খণ্ডিত অংশগুলি প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে শুরু করে মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে। সাধারণ কোন বোমা ফাটলে তার টুকরোগুলি যেমন আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাপারটা যেন দাঁড়ালো কতকটা সেইরকম। বিশাল সেই বস্তুটির অংশগুলিই শেষ পর্যন্ত তৈরি করে এক একটি গ্যালাকসি। এক একটি গ্যালাকসির মধ্যে তৈরি হয় কোটি কোটি নক্ষত্র। কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে বিস্ফোরণের প্রবল শক্তির প্রভাবে গ্যালাকসিগুলি সেই যে ছুটতে শুরু করেছিল, সেই ছোটা আজও চলেছে। গ্যালাকসিগুলির ছুটে চলার এই ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন বিজ্ঞানী রালফ এ. অ্যালফের, হানস বেদে এবং জর্জ গ্যামো। তাঁরা বললেন, এই ছুটে চলা চলবে অনন্তকাল। আর এর ফলে মহাবিশ্বের আয়তন ক্রমে বেড়েই চলবে।

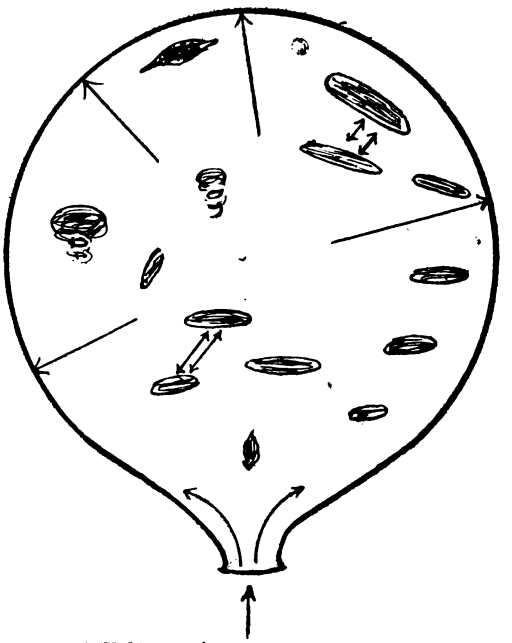

অবশ্য এ ব্যাপারটা নিয়ে কথাও তুলেছেন কেউ কেউ। পরে তৈরি, হয়েছে আরো একটি তত্ত্ব। এই তত্ত্বের নাম 'থিয়েরী অভ্ দ্য পালসেটিং ইউনিভার্স।' অর্থাৎ 'সম্প্রসারণ-সংকোচন তত্ত্ব।' এই তত্ত্বে বলা হলো, মহা-বিশ্বের সমস্ত গ্যালাকসি ছুটে চলেছে ঠিকই। এই ছুটে চলার শক্তি বিস্ফোরণের দরুন তারা পেয়েছিল হয়তো ঠিক। কিন্তু একটা সময় আসবে যখন এই শক্তি দারুন ভাবে কমে যাবে। তখন আর তারা ছুটতে পারবে না। তখন পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণের টানে তারা আবার মিলিত হবে। মিলিত হয়ে তৈরি করবে এক বস্তু। অগ্নি-গোলক। যেমনটি ছিল কোটি কোটি বছর আগে। তারপর সেই অগ্নিগোলকে ঘটবে আবার বিস্ফোরণ। আবার নতুন নতুন গ্যালাকসি হবে তৈরি। তারা আবার ছুটতে থাকবে। তারপর আবার সংকোচন এবং বিস্ফোরণ। আর এইভাবেই চলবে একবার সম্প্রসারণ, পরে সংকোচন। তারপর আবার বিস্ফোরণ।

কেউ কেউ আবার এ কথাও মানতে রাজি নন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজ্ঞানী হারমান বনডি, টমাস গোল্ড এবং ফ্রেড হয়েল। ফ্রেড হয়েল তো একটি নতুন তত্ত্বই দাঁড় করিয়েছেন। যার নাম 'স্টেডি স্টেট থিয়েরী' বা স্থিতিশীল তত্ত্ব।' এই তত্ত্বে বলা হলো, সৃষ্টির গোড়ায় মহাবিশ্বের অবস্থা যেমন ছিল এখনও তেমনিই রয়েছে। না বাড়ছে, না ছোট হচ্ছে। নক্ষত্র বা নক্ষত্রজগৎ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যায়, তখন সেই শূন্যস্থানে জন্ম নেয় নতুন এক নক্ষত্র বা নক্ষত্রজগৎ। যারা দূরে সরে যাচ্ছে, বয়েস বাড়ার সঙ্গে এক সময় তারা হারিয়ে ফেলে তাদের শক্তি। আর তার ফলে তাদের নাক্ষত্রিক অস্তিত্ব ধ্বংস হয়। অর্থাৎ তারা মারা যায়। তাদের মৃত-দেহের বস্তুকণা বা শক্তিই গড়ে তোলে নতুন নক্ষত্র বা নক্ষত্রজগৎ। এইভাবে একদিকে চলছে মৃত্যু, আর একদিকে জন্ম। ফলে সৃষ্টির গাড়ায় মহাবিশ্বের যা আয়তন ছিল, সেই আয়তন এখনও তেমনিই রয়েছে। না বাড়ছে, না কমছে। এই স্থিতিশীল অবস্থা অনন্তকাল ধরে থাকবে। আর সেই সঙ্গে নক্ষত্র এবং নক্ষত্র-জগতের জন্মমৃত্যুর হার এমনভাবে থাকবে, যাতে করে সৃষ্টির গোড়ায় যতগুলি নক্ষত্র বা নক্ষত্রজগৎ ছিল—চিরকাল সেই সংখ্যা একইরকম থাকবে।

যাই হোক। শেষ পর্যন্ত প্রথম তত্ত্বটিই এখনও পর্যন্ত জোরালোই থেকে গেছে। 'বিগ্ ব্যাংগ'-এর পর মহাবিশ্বের সেই যে বেড়ে চলা, তা চলবে। অনন্তকাল ধরেই হয়তো চলবে। আমরা যে গ্যালাকসিতে বাস করছি, তার নাম 'দুগ্ধপথ' গ্যালাক্সি। সূর্য এই গ্যালাকসিরই একটি নক্ষত্র। তা হলে ভেবে দেখ, আমরাও মহাবিশ্বে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছি। এ সব কথা ভাবলে কেমন অবাক লাগে। তাই না ?

আমরা স্বপ্ন দেখি কেন

জয়ন্ত সুকুল

আমরা স্বপ্ন দেখি কেন-একথা আলোচনার করার আগে স্বপ্ন কাকে বলে একথা বলে নেওয়া ভালো। আমাদের চেতনা যখন থাকে অর্থাৎ যখন সচেতন অবস্থা এবং চেতনাহীন নিদ্রিত অবস্থার মাঝামাঝি স্তরে আমরা যা দেখি বা দেখেছি সেই দেখার স্পষ্টতা নিয়ে যে ক্রিয়াহীন কল্পনা আমাদের মনের মধ্যে ভেসে উঠে তাকেই আমরা স্বপ্ন বলি। আমরা সবাই নানান রকমের স্বপ্ন দেখি এবং ঐ স্বপ্নের স্বরূপ ও কারণটি এখনও আমাদের কাছে রহস্যাবৃত। অথচ স্বপ্নের ব্যাপারটি আমাদের কাছে প্রায়ই মনোরম সুন্দর মনে হয় না কি? স্বপ্নে আমরা দেখি বাস্তবের কতকগুলো প্রতিরূপ। এবং ঐ প্রতিরূপগুলোই খুব সহজে মনের সচেতন স্তরে এসে জড়ো হয়। ঐসব প্রতিরূপকে জড়ো করতে আমাদের কোনরকম শ্রম করতে হয় না। অর্থাৎ এগুলি গভীর ঘুমের সময়কার নিষ্ক্রিয় কল্পনার রূপবিশেষ।

স্বপ্ন যখন আমরা দেখি, তখন মন থেকে ইচ্ছা এবং বিচারবিবেচনার শক্তি একেবারেই লুপ্ত হয়। স্বপ্নে যে প্রতিরূপগুলো দেখি তা চলমান জগৎ এবং জীবনের বাস্তব ঘটনা মনে হয় এবং আমরা তা বিশ্বাস করি। মানুষ যতক্ষণ স্বপ্ন দেখে ততক্ষণ সে এসব ঘটনাকে স্বপ্ন বলে মনে করতে পারে না। স্বপ্নগুলো অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব হলেও এগুলোকে মন অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলে না।

প্রাচীনকাল থেকেই মনোবিজ্ঞানের এই বিষয়টি নিয়ে নানান আলাপআলোচনা হয়েছে। এই আলোচনার সূত্র ধরেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের মতবাদও প্রচলিত হয়েছে। ভারতবর্ষের জ্যোতিষীরা বলেছেন যে, স্বপ্নকে মাধ্যম করে আমাদের অবচেতন মন কোন বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী প্রকাশ করে। একথা সে আদৌ ঠিক নয় তা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে আরো ও যুক্তিসিদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হয়ে।

এ সম্পর্কে আবার শারীরতত্ত্ববিদেরা বলেছেন যে, মানুষ স্বপ্ন দেখে তখনই যখন তার ঘুমের সময় পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া কিংবা রক্তচলাচল ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। অনেক সময় বুকের ওপর হাত রেখে শোবার জন্যে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে তখন অনেকে স্বপ্ন দেখে এবং তারা মনে করে যে, কে যেন তাদের বুকের ওপর পাথর চাপিয়েছে। আসলে এই সমস্ত কারণ কিন্তু স্বপ্ন দেখার সত্যিকার ব্যাখ্যা নয়। কারণ শারীরিক দুর্বলতা অর্থাৎ দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ মানেই যে স্বপ্নের উৎস একথা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তা ছাড়া এসব ব্যাখ্যার পরও আরো অনেক মনোবিজ্ঞানী স্বপ্ন দেখার কারণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ঊনিশশো খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন স্বপ্ন সম্পর্কে। তিনি স্বপ্নকে দু'ভাগে ভাগ করছেন। এক শিশুদের স্বপ্ন, দুই পরিণত বয়স্ক মানুষের স্বপ্ন। শিশুদের স্বপ্ন সম্পর্কে বলা যায় যে, শিশুমনে অনেক সময় নানারকমের ইচ্ছা জাগে, কিন্তু স্বইচ্ছাই বাস্তবে পূরণ হয় না। যে সব ইচ্ছা পূরণ হয় না, সেগুলোকে শিশু পরিণতবয়স্ক মানুষের মতো মনের মধ্যে অবদমিত করে রাখে না। তার কারণ শিশুদের মধ্যে ইচ্ছাকে অবদমিত করে রাখার প্রবণতা থাকে না। সে কারণে শিশুদের মধ্যে অপরাধবোধ নেই এবং শিশুরা তাই তাদের ইচ্ছাগুলোকে অন্যায় মনে করে না। পরবর্তী সময়ে শিশুদের এই অবদমিত ইচ্ছাগুলো অবিকৃতভাবে স্বপ্নের মধ্যে চরিতার্থ লাভ করে। যেমন কোন শিশু নৌকোয় চড়তে ভালোবাসে। কিন্তু তার অভিভাবক জীবননাশের ভয়ে তাকে নৌকোয় চড়তে দেয় না। এখানে শিশুর মনে নৌকোয় চড়ার সাধ অবদমিত হচ্ছে। এই অবদমিত সাধই শিশুর স্বপ্নে প্রতিভাত হয়। আর পরিণত বয়স্ক মানুষের অনেক ইচ্ছা কামনা সামাজিক সম্মান ও অনুশাসনের ভয়ে অবদমিত হয়েও সেগুলি স্মৃতির আড়ালে না গিয়ে স্বপ্নে প্রকাশিত হয়ে সেই মানুষকে তৃপ্তির পথ দেখায়। যেমন কোন ব্যক্তি তার আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখল যে, তার সেই আত্মীয়ের আলমারির ভেতরে অনেক টাকার নোট জড়ো করা আছে। ব্যক্তিটির এই টাকা দেখে পাওয়ায় ভীষণ ইচ্ছে জাগলো মনে। সামাজিক সম্মান ও আইনের ভয়ে সে মন থেকে জোর করে ঐ ইচ্ছে সরিয়ে আনলো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কিছুদিনের মধ্যে সে স্বপ্নের মধ্যে অনুরূপ একটি অর্থপ্রাপ্তির সুযোগের স্বপ্ন দেখলো। এইরকম ইচ্ছার ইচ্ছাপূরণকে অবদমিত ইচ্ছার সাক্ষাৎ বলে মনোবিজ্ঞানে।

স্বপ্নের কারণ সম্পর্কে জ্যোতিষীদের এবং শারীরতত্ত্ব-বিদদের ব্যাখ্যা খুব একটা বাস্তব বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। স্বপ্নের ব্যাপারটা হচ্ছে রহস্যময় এবং জটিল। স্বপ্ন দেখা পুরোপুরি সুস্থত্বের নিদর্শন নয়। প্রত্যেকটি মানুষই কোন না কোনভাবে বিকারগ্রস্ত। তাই এক্ষেত্রে স্বপ্ন যদি মানুষের ইচ্ছা আকাংক্ষা ও কামনা পূরণের মাধ্যম হয়, তা হলে এটা ক্ষতিকর নয়, বরঞ্চ প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবাত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার মিলনের যে স্বপ্ন কিম্বা মহাত্মা গান্ধীর যে সুন্দর ভারতবর্ষ গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল—সেগুলি কী অবদমিতরূপে প্রকাশিত হয়েছিল স্বপ্নে? ফ্রয়েডের মতবাদ অনুসারে স্বপ্ন যদি ইচ্ছা পূরণের প্রকৃত মাধ্যম হয় তা হলে বলতে পারি যে, যতদিন মানুষের কল্পনা থাকবে, ভালোবাসা ও ভালো-লাগায় অনুভূতি থাকবে ততদিনই মানুষ স্বপ্ন দেখবে। অর্থাৎ স্বপ্নের প্রবাহ আবহমান কালের।

16 গোবিন্দ সেন লেন, কলকাতা-12

বিজ্ঞান-সংবাদ

পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবির 83

গত 26 ফেব্রুয়ারি থেকে 5 মার্চ পর্যন্ত আট দিন ব্যাপী পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবির বিড়লা শিল্প ও কারিগরী প্রদর্শশালায় অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান শিবির ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন উড়িষ্যার শিক্ষামন্ত্রী গঙ্গাধর মহাপাত্র এবং সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস।

এই অষ্টম বিজ্ঞান শিবিরে আসাম ছাড়া পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যের 250 বিজ্ঞানানুরাগী ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। 117টি স্কুল ও বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিনিধিরা 150টি মডেল প্রদর্শন করে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৫0টি স্কুল এবং 25টি বিজ্ঞান ক্লাব ছিল।

5 মার্চ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম বঙ্গের যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এবং পুরস্কার বিতরণ করেন পশ্চিমবঙ্গের যুব করণ দপ্তরের অধিকর্তা এ কে দত্ত চৌধুরী। মহম্মদ শাহীনুর ইসলামের মডেল সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় এবং শিবিরে অংশ গ্রহণকারী রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠের কৃতিত্ব অর্জন করে মণিপুর।

গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত শ্যামসুন্দর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়ে গত 31 জানুয়ারী থেকে 2 ফেব্রুয়ারী তিনদিনব্যাপী একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী আয়োজন করে ফোটন সায়েন্স সেন্টার। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মেদিনীপুর জেলা উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শক অমিয় রায় চৌধুরী। প্রদর্শনীতে ছিল 25টি চার্ট, মডেল এবং জীবন বিজ্ঞানের বিভিন্ন সংগ্রহ। প্রদর্শনী দেখতে বহু দূর গ্রামের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষ আসেন।

বিজ্ঞান সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ

ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত পয়লা মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে সাহা ইনস্টিট্যুট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর বক্তৃতাকক্ষে পাঁচ সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞান সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক পূর্ণেন্দুকুমার বসু এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সদ্যপ্রয়াত অশোককুমার সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট কাল নীরবতা পালন করা হয়।

এই প্রশিক্ষণের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ডঃ অনাদিনাথ দাঁ এবং সমরজিৎ কর। এদেশের সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞান-সংবাদের প্রতি ঔদাসিন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন উদ্বোধক ডঃ পোদ্দার এবং সভাপতি অধ্যাপক বসু। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র। মোট কুড়িজন শিক্ষার্থী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেন।

খড়গপুর আই আই টি-তে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতামালা

গত 23 ফেব্রুয়ারী খড়্গপুরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ টেজনোলজির 'আর্থ সায়েন্স স্টাডি সার্কেল' মাসিক বক্তৃতা-মালার সূচনা করেছেন। ভূবিদ্যা ও ভূপদার্থবিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে প্রতিমাসে এঁরা একটি লোক-রঞ্জক বক্তৃতার আয়োজন করবেন। 'ম্যাগনেটোমিটার পদ্ধতিতে সাবমেরিন নিরূপণ' প্রসঙ্গে প্রথম বক্তৃতা দেন ডঃ তপনকুমার ভট্টাচার্য। এ ব্যাপারে প্রোটন প্রিসিশন ম্যাগনেটোমিটার অপরিহার্য বলে তিনি মন্তব্য করেন। বর্তমানে ভারতে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। তবে আমেরিকা ও রাশিয়ার তুলনায় আমরা খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছি। আলোচনায় যোগদান করেন ডঃ শিশির সেন, ডঃ শরদিন্দু সেনগুপ্ত, ডঃ এস এইচ রাও প্রমুখ।

সফল দ্বিতীয় ভারতীয় কুমেরু অভিযান

কুমেরু মহাদেশে দুমাস কাটিয়ে ভারতের দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলটি গত 21 মার্চ গোয়ার মরমুগাও বন্দরে ফিরে এসেছেন। দুমাস ধরে তাঁরা কুমেরু অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। খুব উত্তেজনাপূর্ণ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তাঁরা সঞ্চয় করেছেন। প্রথম অভিযাত্রী দল সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাসেট হারিয়ে ফেলেছিলেন। দ্বিতীয় দল তা উদ্ধার করে এনেছেন এবং 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী' আবার সক্রিয় করে এসেছেন। হিমশীতল মেরুঅঞ্চলে শরীর ও মনের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখেছেন তাঁরা। দলের বিজ্ঞানীরা কুমেরুর তুষার, শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ ও অন্যান্য ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে প্রাণের আদিম রূপ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন।

নিরক্ষরতা সমাজের বড় অভিশাপ
আসুন, এর থেকে মুক্ত হতে সকলে সামিল হই

* নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা মানুষের জীবনে গভীরতম অন্ধকার দিক। এই অন্ধকারময় অভিশাপ থেকে সাক্ষরতা ও শিক্ষার আলোতে উত্তীর্ণ হওয়াই বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য।
* এই লক্ষ্য সাধনে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে আছে : শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান ; উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা ; অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষার প্রসার ; বিভিন্ন স্তরে পাঠ্য-সূচীর যুগধর্মী পরিবর্তনসাধন ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষণীয় ভাষা হিসাবে মাতৃভাষার প্রবর্তন।
* বর্তমান বামফ্রন্টের ৩৪ দফা কর্মসূচী অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রের লক্ষ্যমাত্রা আরোও সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপক : ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগকে সুনিশ্চিত করার জন্য বিনামূল্যে টিফিন, স্কুলের পোষাক, চিকিৎসাক্ষেত্রে সাহায্য, পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ব্যবস্থা ; তপশিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসী ছাত্রদের উৎসাহিত করতে বিনা খরচে ছাত্রাবাসে থাকার যাবতীয় ব্যবস্থা, বয়স্ক শিক্ষা ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা সহ নিরক্ষরতার দূরীকরণের কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা।
* উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গণতান্ত্রিককরণের কাজকে অব্যাহত রাখা ; শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা-দান নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করা ; উর্দু, নেপালী, হিন্দী এবং সাঁওতালী ভাষার ক্ষেত্রে উৎসাহদান ; মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক ইংরাজী শিক্ষার যথাযথ গুরুত্ব আরোপ এবং ভাষাশিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি সাধন।

শিক্ষাকে সার্বজনীন, বৈজ্ঞানিক ও জীবনমুখী করে তুলতে আপনিও এগিয়ে আসুন :

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২৩৪১ তথ্য

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

স্কন্ধকাটার কিনোয়া

জীবন ভৌমিক

শেষ বৈশাখের তপ্ত দুপুর। বেলা আড়াইটে। রোদের তেজ এত বেশি যেন আগুন জ্বলছে চারদিকে। তার সঙ্গে গরম বাতাস। বাইরে বেরুলে গায়ে ফোস্কা পড়ে। আশেপাশের সমস্ত বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ।

ডঃ চ্যাটার্জি বালিগঞ্জে তাঁর দোতলার ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিলেন। দক্ষিণ দিকের এই ঘরটায় কাঁচের বড় বড় জানলা। ভারি পর্দা ঝুলছে। নিচে একফালি বাগান, চারদিকে ছ'ফিট উঁচু পাঁচিল। তার গায়ে লাগোয়া বেশ কিছুটা পোড়ো জমি। বহু দিন আগে এখানে একটা কারখানা ছিল। এখন শুধু তার ভাঙ্গা পাঁচিল আর আগাছা জঙ্গল।

কাঁচের জানলা ভেদ করে আওয়াজটা দক্ষিণ দিক থেকেই এলো। ঠিক তাঁর বাড়ির নিচে থেকে। স্তব্ধ দুপুরে এমন এক মর্মভেদী আওয়াজ কানে এলে মনে চাঞ্চল্য আসবেই। *প্রথমবার শুনেই ডঃ চ্যাটার্জী চমকে উঠেছিলেন। প্রাণপণ* চিৎকার—'বাঁচাও—'। ডেস্ক থেকে উঠে ডঃ চ্যাটার্জি পর্দা সরিয়ে জানলার কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরেটা যখন দেখছিলেন, তখনই আরেকবার একই আর্তনাদ শুনতে পেলেন। এবার যেন আর্তনাদটা থমকে গেল। জানলাটা খুলে একটু ঝুঁকে ডাইনে বাঁয়ে দেখলেন তিনি। যতখানি দেখা গেল তাতে কিছু বোঝা গেল না! কিন্তু ব্যাপারটা কী? এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ডঃ চ্যাটার্জি একরকম দৌড়ে নিচে এসে এবড়ো-খেবড়ো মাটি আর কাঁটাঝোপ ডিঙ্গিয়ে বাগানের পাঁচিলের ধারে এসে দাঁড়ালেন। এবং হঠাৎই তাঁর পায়ের কাছে দেখতে পেলেন রক্তের স্রোত। তাঁর একটু সামনে পাঁচিল ঘেঁষে একটি মানুষের মৃতদেহ, সম্পূর্ণ নগ্ন, গলা থেকে কাটা মুণ্ডটা নেই। স্কন্ধকাটা দেহটা তখনও কাঁপছে থরথর করে। আর সে কী রক্ত!

সময় নষ্ট করলেন না ডঃ চ্যাটার্জি। পুলিশ স্টেশন ওখান থেকে তিন মিনিটের পথ। তিনি দৌড়ে ল্যাবরেটরিতে এসে থানায় ফোন করলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে থানার ও-সি কে এক মুহূর্ত দেরি না করে চলে আসতে অনুরোধ করলেন। সময় হিসেব করে দেখলেন, খুন হয়েছে মাত্র সাত মিনিট আগে।

অসম্ভব মনের জোর নিয়ে ডঃ চ্যাটার্জি খুব তাড়াতাড়ি তাঁর ইলেকট্রিকাল ডিসচার্জ যন্ত্রে ব্যাটেরি লাগিয়ে নিলেন এবং ফ্যান্টম ক্যামেরাটি পিঠে ঝুলিয়ে নিচে নেমে অস্থির

ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন ডঃ চ্যাটার্জি। সর্বনাশ করেছে! হাতে দশ মিনিটের বেশি সময় নেই। এত বড় একটা সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে! অথচ পুলিশের বিনা অনুমতিতে এসব ক্ষেত্রে তো কিছু করাও উচিত নয়।

ঐ তো এসে গেছে পুলিশের জীপগাড়ি! খ্যাতনামা একজন বিজ্ঞানী হিসেবে ডঃ চ্যাটার্জিকে পুলিশ আগে থাকতেই চেনে। জীপগাড়ির ক্রুদ্ধ গর্জনে নিঝুম দুপুরটা আবার যেন কোন মন্ত্রে জেগে উঠলো। লোকজন বেরিয়ে আসতে লাগলো একে একে।

থানার ও-সি গাড়ি থেকে নামতেই ডঃ চ্যাটার্জি তাঁকে নিয়ে ভিড় সরিয়ে স্পটে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ 'আপনাদের যা করবার করবেন, আগে আমাকে একটা ফটো নেবার পারমিশন দিন। আপনারা আসতে আর একটু দেরি করলে আমি আপনাদের পারমিশন ছাড়াই ফটো নিতে বাধ্য হতাম। এমন সুযোগ কোনও গবেষক বা বিজ্ঞানীর পক্ষে ছাড়া সম্ভব নয়। আপনাকে আমি পরে সব বুঝিয়ে বলছি— কথা বলতে বলতে ডঃ চ্যাটার্জি তাঁর যন্ত্রপাতি সাজিয়ে ফেলেছেন। থানার ও-সি শুধু বললেন ঃ 'কী জানি স্যার, যে জিনিস চোখে দেখাই যাচ্ছে না তাকে আপনি ক্যামেরাতে পাবেন কী করে।'

ফটো তোলা শেষ করে ডঃ চ্যাটার্জি হাসিমুখে বললেন ঃ 'এবার আপনাদের ইনভেস্টিগেসনের কাজ শুরু করুন।'

শুরু হয়েছিল। কিন্তু সমাধানের কোনও আলো দেখা যাচ্ছিল না। জিজ্ঞাসাবাদ, পোস্ট মর্টম, পুলিশ কুকুর সবই করা হয়েছিল। কিন্তু নিহত ব্যক্তির বয়স ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই পাওয়া যায় নি। তার বয়স ছিল সাতাশ থেকে আঠাশ।

খুনী যে খুব বুদ্ধিমান এবং কাজটি যে সুপরিকল্পিত, এ বিষয়ে সন্দেহ রইলো না। কারণ যাকে খুন করা হয়েছে গর্দান থেকে তার মাথা কেটে বাদ দিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এক টুকরো সুতোও তার গায়ে ছিল না। এমন কি ডঃ চ্যাটার্জি প্রথমে যা লক্ষ্য করেন নি তা হলো নিহত যুবকের হাতের দুটি বুড়ো আঙুলও কেটে নেওয়া হয়েছে। যাতে তার আঙুলের ছাপ থেকে পুলিশ কিছু হদিশ না পায়। পুলিশের কুকুরের দৌড় ছিল সামনের একটা জলাশয় পর্যন্ত। তোলপাড় করেও ঐ জলের মধ্যে থেকে কিছু পাওয়া যায় নি। খুনী হয়তো সেই জলাশয়ে হাত-পা ধুয়েছে। জুতোর ছাপ ছিল বটে ঐ পথে। কিন্তু সেটাও ছিল বিভ্রান্তিমূলক। স্কন্ধকাটা ঐ উলঙ্গ মৃতদেহ দেখে তাকে সনাক্তকরণের লোকও পাওয়া যাচ্ছিল না।

ঠিক এই অবস্থায় একদিন রাত্রি বেলায় পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর থেকে দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এলেন ডঃ চ্যাটার্জির কাছে। সম্ভবত খুনের ঘটনার সাত দিনের মাথায়।

'কিছু পেলেন?—' জিজ্ঞেস করলেন গোয়েন্দা পুলিশ। ডঃ চ্যাটার্জি পাল্টা প্রশ্ন করলেন—'আপনাদের ইনভেসটি-গেশনের খবর কী?'

'এখনও পর্যন্ত আনসাক্সেসফুল। এখন একমাত্র ভরসা যাকে খুন করা হয়েছে তার পরিচয়। মিসিং স্কোয়াড থেকেও ইনফরমেশন নেই!—'

দ্বিতীয় অফিসার এতক্ষণ ডঃ চ্যাটার্জির ল্যাবরেটরি ঘরের চারদিকে কৌতূহলী চোখে দেখছিলেন। তিনি বললেন ঃ 'তবে এটা নিশ্চিত হয়েছি যে নিহত ব্যক্তি এখানকার লোক নয়। তা আপনার ছবির কোনও আশা —মানে সেইজন্যেই আসা।'

প্রথমজন বললেন ঃ 'একজাকট্‌লি। এটা আমাদের ডিউটি। আপনাকে শুধু শুধু বিরক্ত করতে এলাম——'

ডঃ চ্যাটার্জি এতক্ষণ ওঁদের কথা শুনছিলেন আর মাঝে মাঝে কতগুলো কার্ডে নাম্বারিং করছিলেন। এবার সরাসরি মুখ তুলে বললেন ঃ 'কেন, শুধু শুধু কেন?'

উত্তর দিলেন একজন—'না মানে; আপনার রিসার্চের বিষয়টা অবিশ্বাস্য। শুনেছি গাছপালা নিয়ে এ ধরনের কিছু পরীক্ষা চলেছে, কিন্তু একটা মানুষের গলা কোটে খুন করে তার শরীর থেকে মাথাটাই আলাদা করে সরিয়ে ফেলা হলো। মাথা না পেয়েও আপনার ক্যামেরা ধড়মুণ্ডু দুই-ই পাবে কোথা থেকে?'

'অবিশ্বাস্য অসম্ভবকে বিশ্বাসযোগ্য সম্ভব করে তোলাই তো বিজ্ঞানের কাজ'—ডঃ চ্যাটার্জি এই কথা বলে তাঁর ড্রয়ার থেকে একটা বড় এনভেলাপ বের করে আবার বললেন—'আমার কাজ আজকেই শেষ হয়েছে, বিশ্বাস হয় কিনা দেখুন।' এনভেলাপ থেকে একটা বড় নেগেটিভ ফিল্ম বের করে তাঁর ডান পাশে রাখা গ্লাস কেসে রাখলেন। আলো জ্বাললেন। দেখা গেল অর্ধশায়িত অবস্থায় ধড়-মাথা সহ উলঙ্গ একটা শরীর।

গোয়েন্দা অফিসার দুজনের মুখে কোনও কথা নেই। নিজেদের চোখকে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ ঐ ফিল্মটার দিকে চেয়ে থেকে শুধু বললেন— 'এও সম্ভব!'

ডঃ চ্যাটার্জি সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন ঃ 'কাল এসে এটার পজিটিভ প্রিন্ট নিয়ে যাবেন।'

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। বালিগঞ্জ থানা থেকে ঐ

ছবির যুবকের কোনও হদিশ পাওয়া যায় নি। ছবির কপি করে অন্যান্য সব থানায় পাঠানো হলো। খবর এলো হাওড়া জেলার বালি থানা থেকে। নিহত যুবক ঐ অঞ্চলের ছেলে। দাগী আসামী হিসেবে থানার খাতায় তার নাম রয়েছে। বাড়িতে তার একমাত্র বৃদ্ধা মা। তার কাছে থেকে জানা গেছে যে, তার ছেলে তাকে বলে গেছে মাসখানেকের জন্যে সে বাইরে যাচ্ছে। এরকম মাঝে মাঝে যায়। তাই তার মা নিশ্চিন্ত। আসলে তার অন্য একজন সঙ্গী, মানে যে খুনী, সে এই কথা বলেই তাকে বালি থেকে বালিগঞ্জে নিয়ে এসেছিল। উদ্দেশ্য ছিল খুন করা। নিজেদের মধ্যে গোলমালের পরিণতি আর কী।

নিহত যুবকের সাঙ্গোপাঙ্গদের ভেতর থেকে এরপর খুনীকে ধরতে পুলিশের বেগ পেতে হয় নি।

এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ চ্যাটার্জি তাঁর কাজের বিবরণ এইভাবে দিয়েছিলেন—

রাশিয়ার বিজ্ঞানী এস-ডি-কিরলিয়ান এবং তাঁর স্ত্রী ভ্যালেণ্টিনা কিরলিয়ান আবিষ্কার করেছিলেন ইলেকট্রো-ফটোগ্রাফি। ওঁদের নামানুসারে পদ্ধতিটির নাম করা হয় 'কিরলিয়ান ফটোগ্রাফি।' ঐ দেশেরই অপর এক বিজ্ঞানী অধ্যাপক আদামেস্কো পরে জানান যে, গাছের পাতার কোনও অংশ কেটে ফেলে দিয়ে যদি সঙ্গে সঙ্গে কিরলিয়ান পদ্ধতিতে ছবি তোলা হয় তা হলে কখনও কখনও ঐ ছবিতে পাতার অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে কেটে বা ছিঁড়ে ফেলা অংশেরও ছবি পাওয়া যায়। আদামেস্কো এর নাম দিয়েছিলেন 'ফ্যাণ্টম লীফ এফেক্ট।'

ব্রেজিলের বিজ্ঞানী এইচ-জি-এণ্ট্রাডে এবং মার্কিন দেশের থেলমা মম এই উপায়ে পরীক্ষা শুরু করে শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেন। এঁরা কিন্তু কেউই নিজেদের গবেষণার বিবরণ প্রকাশ করেন নি। তবে এটুকু জানা গিয়েছিল যে, এই ভুতুড়ে ফটোগ্রাফির আসল ব্যাপারটি হলো যে চেতন পদার্থটির ছবি তোলা হয় তার অবৈদ্যুতিক ধর্মগুলি একটা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের গতির প্রভাবে বৈদ্যুতিক ধর্মে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং

ফিল্মটার দিকে চেয়ে থেকে শুধু বলছেন এও-সম্ভব।

পদার্থটির বৈদ্যুতিক আধান পদার্থের নিচে বা ওপরে রাখা ফটো ফিল্মের উপর পড়ে সম্পূর্ণ পদার্থটির ছবি ওঠে।

জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ডঃ চ্যাটার্জি বিষয়টি আরও একটু বিশদ করে বলেন: প্রতিটি চেতন বস্তুর 'বায়োপ্লাজমা' নামে একটা ধর্ম থাকে। এই বায়োপ্লাজমার অসংখ্য মুক্ত এবং আহিত কণাই বস্তুটির নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন রক্ষা করে। চেতন বস্তুর কোনও অংশ কেটে ফেলে দিলেও তার চারপাশে বস্তুটির বায়োপ্লাজমা কণা-গুলো ফেলে দেওয়া অংশের শূন্যস্থানে অন্তত পনের থেকে বিশ মিনিট নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে ভাসতে থাকে। ইলেকট্রোফটোগ্রাফিতে সঠিক পরিসীমাসহ সেই কণাগুলো

পূর্বের মূল প্যাটার্ন নিয়ে ধরা পড়ে বলেই সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়। তবে কিরলিয়ান পদ্ধতিতে সাফল্য নিশ্চিত নয় জেনে এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণা চলতে থাকে।

ডঃ চ্যাটার্জি আরও বলেন - 'সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যোৎস্নাকুমার চৌধুরী এবং তাঁর দুই জন সহযোগী ডঃ প্রকাশ কেজরিওয়াল এবং ডঃ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ফ্যাণ্টম ফটো তোলার জন্যে এক বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎ-যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা অনেক জটিলতা মুক্ত।

সাংবাদিকদের কাছে ডঃ চ্যাটার্জি সবিনয়ে বলেন— 'আসল কৃতিত্ব এইসব বিজ্ঞানীদেরই। তাঁদের অত্যাশ্চর্য এই আবিষ্কারের ভিত্তিতে আমার সামান্য কাজ। গাছের পাতা, ব্যাঙের পা, ইঁদুরের মাথা কেটে বাদ দিয়ে কাটা অংশ সমেত সম্পূর্ণ বস্তুর ফ্যাণ্টম ফটো আমি ইতিমধ্যেই পেয়েছি। এবার পেলাম মানুষের খণ্ডিত না-পাওয়া, না-দেখা অংশের ছবি। আমার ল্যাবরেটরির পাশে এই পৈশাচিক খুন সেই অপ্রত্যাশিত সুযোগ এনে দিয়েছে। আপনারা তো শুনেছেনই যে, এই ফ্যাণ্টম ফটোর সাহায্যে যে ফটো পাওয়া গেছে তার সাহায্যেই এমন একটা সুপরিকল্পিত বীভৎস খুনের আসামীকে এত সহজে ধরা সম্ভব হয়েছে।

23 ব্র্যাবোর্ন রোড, কলিকাতা-1

মশলার একাল-সেকাল

অসিতবরণ মণ্ডল

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে যা বাংলা করলে দাঁড়ায়—'ভগবান পৃথিবীতে মাংস পাঠিয়েছেন, দৈত্য পাঠিয়েছে রাঁধুনী। ভারতবর্ষে মশলা জন্ম নিয়েছে। মাংস এবং মশলা মিশে সুন্দর জিনিস তৈরী হয়ে আসে'। হ্যাঁ, ভারতবর্ষেই মশলার জন্ম হয়েছে। তখনও গ্রীস এবং রোমের আবির্ভাব হয় নি, তারও শত শত শতাব্দী পূর্বে জাহাজে করে ভারতীয় মশলাপাতি, বস্ত্রাদি এবং সুগন্ধি দ্রব্য পাড়ি দিত সুদূর মেসোপটেমিয়া, আরব এবং মিশরে। তবে ভারতে মশলার চাষ কবে যে শুরু হয়েছে তার ইতিহাস আমাদের জানা নেই। এককালে মশলা ছিল রাজকীয় বস্তু, মূল্যবান পাথরের সঙ্গে তুলনীয়। মধ্য-যুগে বিদেশীরা ভারতবর্ষকে মশলার দেশ, হীরামাণিক্যের দেশ, রাজামহারাজার দেশ হিসাবে ধারণা পোষণ করতেন। আজকেও ভারতবর্ষকে মশলার দেশ বলে ব্যক্ত করলে অত্যুক্তি হবে না। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা 30 ভাগ মশলা এই ভারতবর্ষ থেকে আসে। এককালে কোনো দেশের সুখসমৃদ্ধি মশলা উৎপাদনের উপর নির্ভর করত। মশলার আয়ের উপর নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গঠন করা হত।

খৃষ্ট জন্মের অনেক আগে থেকেই গ্রীক বণিকেরা অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের সঙ্গে মশলা ক্রয়ের জন্যে দক্ষিণ ভারতের বাজারে ভিড় শুরু করে। এদের সঙ্গে রোমও ভারতের বাজার জমজমাট করে রেখেছিল। ইতিহাসে যে রক্তক্ষয়ী পারথিয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার মূলে ছিল ভারতের মশলার বাজারের সঙ্গে অন্যান্য বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার সংঘাত। মধ্যযুগে যেসব জলপথের সন্ধান বা আবিষ্কারের সুযোগ ঘটেছিল তা বলতে গেলে এই ভারতকে কেন্দ্র করেই। তার অনেকটাই এই মশলাকে কেন্দ্র করেই। ভারতের মশলার মতো অন্যান্য মূল্যবান জিনিস সুদূরের বিদেশীকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল বলেই একদিন নতুন পথ ধরে ভারতে আসার সুযোগ ঘটেছিল। হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল অনেক অনেক নাবিক বণিক এবং ভ্রমণ-পিয়াসীদের।

আজ অবশ্য মশলার তেমন কদর নেই, দামও নেই। হাতে হাতে মশলা ঘোরে। গৃহস্থের রান্নাঘর থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য রন্ধনশালায় মশলার ছড়াছড়ি। কিন্তু এককালে হাজার হাজার মানুষ নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে মশলার মতো মূল্যবান জিনিস আহরণের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। এদেরকে ভবঘুরের মতো ঘুরতে হয়েছে। পথেই জীবনের অনেকটা সময় ব্যয়িত হয়েছে।

1492 খৃষ্টাব্দ। কলম্বাস নতুন মহাদেশের সন্ধান পেলেন। এর পাঁচ বছর পর 1497 খৃষ্টাব্দে

পোর্তুগালের লিসবন বন্দর থেকে চারটি ক্ষুদ্র জাহাজ নিয়ে জলপথে সর্বপ্রথম ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে পৌঁছলেন এবং তারপর অবশ্য এখান থেকেই ঐ পথেই নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। যাওয়া-আসার উভয়মুখী পথ পারাপারে যে ব্যয়ভার হয়েছিল তার প্রায় 60 গুণের মতো খরচখরচা পুষিয়ে নিয়েছিলেন মশলা এবং মশলার সঙ্গে অন্যান্য বস্তু সংগ্রহ করে নিয়ে। সেই সময়েও মশলা ছিল মূল্যবান বস্তু। তার কারণ ভারত তথা এশিয়া মহাদেশ থেকে যে সমস্ত মশলা ইউরোপীয় দেশে রপ্তানি হত তা দিয়ে সেখানকার খাদ্যসমস্যার মোকাবিলা করা হত। এই সময় এক পাউণ্ড আদার মূল্য ছিল একটি মেষের মূল্যের সমান, এক পাউণ্ড জাইফল তিনটি মেষের মূল্যের সমান। তখনকার দিনে গোলমরিচ ছিল সবচেয়ে মূল্যবান মশলা। এক ব্যাগ গোলমরিচের মূল্য একটি মানুষের জীবনের সমান বলে গণ্য করা হত। ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে জলপথে আসার নতুন গতিপথ পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাঘাতের সৃষ্টি করেছিল। ইউরোপীয় দেশগুলির অনেকে মশলার বাজার নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে বিবাদ শুরু করেছে। এই বিবাদ চলে প্রায় তিনশো বছর ধরে। ব্রিটেন, স্পেন, পোর্তুগাল প্রভৃতি দেশ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু করেছিল।

আজকের মতো আগেকার দিনেও মশলাকে ব্যবহার করা হত বিভিন্নভাবে। রন্ধনকার্যে সে যুগে মশলার ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। নানা ধরনের খাবার মুখরোচক বা সুস্বাদু করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের মশলাপাতি যুক্তভাবে বা আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এই সব মুখরোচক খাদ্য পরিবেশনায় পরস্পর সন্তুষ্ট হয়েছে। রন্ধনকার্য ছাড়া সে যুগে মশলা ব্যবহৃত হয়েছে খাদ্যসংরক্ষণে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে এবং ভেষজবিজ্ঞানে। দেখা গেছে, হাতের কাছে যখন সংরক্ষণকারী মশলার অভাব ঘটেছে তখন সাময়িকভাবে খাদ্য সংরক্ষণের অভাবহেতু দুর্ভিক্ষের কালোছায়া স্থানে স্থানে নেমে এসেছে।

বর্তমানেও মশলার ব্যবহার বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। হোটেল রেস্তোঁরায় নানা ধরনের যে সব মুখরোচক খাবার তৈরী হচ্ছে তার মধ্যে অধিকাংশতেই মশলার কারসাজি থাকে। মানুষের স্বাস্থ্যে সম্পদে মশলার দান অপরিমেয়। ক্ষুধাবর্ধক হিসাবে, শরীরে জীবাণু প্রবেশ প্রতিরোধে কোনো কোনো মশলার ভেষজগুণ পরিলক্ষিত হয়েছে। রক্তচাপ এবং থ্রম্বোসিসের মতো অসুখ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মশলার ভেষজগুণকে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে।

বর্তমানে আমাদের দেশের জাতীয় সমৃদ্ধিতে মশলার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করা যাক্। পৃথিবীতে পঁচিশটির মতো মশলা চাষ চলে, তার মধ্যে অনেকটাই আমাদের ভারতবর্ষেই চাষ হয়। যে কটি মশলা ভারতের জাতীয় আয় সমৃদ্ধি করছে সেগুলির মধ্যে এলাচ (ছোট এবং বড়), গোলমরিচ, আদা, হলুদ এবং লঙ্কাই প্রধান। মশলা চাষ থেকে ভারতের যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তার একটা পরিসংখ্যান নেওয়া যাক্। 1971-72 সালে ভারত বৈদেশিক বাজারে নানা ধরনের 65979 মেট্রিক টন মশলা রপ্তানি করে আয় করে 36 কোটি টাকার মতো। 72-73 সালে 45,191 মেট্রিক টন মশলা রপ্তানি করে 29 কোটি টাকার মতো, 73-74 সালে 61,214 মেট্রিক টন মশলা রপ্তানি করে। তার থেকে আয় আসে 54 কোটি টাকা। 78-79 সালে মোট মশলা রপ্তানি হয়েছে 99945 মেট্রিক টন। এর মধ্যে গোলমরিচের পরিমাণ 15263 মেট্রিক টন এবং এলাচের পরিমাণ 2949 মেট্রিক টন। গোলমরিচ থেকে আয় এসেছে 24 কোটি টাকা এবং এলাচ থেকে আয় এসেছে 58 কোটি টাকা। ঐ বছর মশলা থেকে মোট আয় এসেছে 160 কোটি টাকা। 1979-80 সালে মোট মশলা রপ্তানি হয়েছে 85897 মেট্রিক টন। মোট আয় হয়েছে 135 কোটি টাকা। এর মধ্যে গোলমরিচ থেকে 33 কোটি টাকা এবং এলাচ থেকে 59 কোটি টাকা আয় হয়েছে। অনেকে গোলমরিচকে বলে থাকে মশলার রাজা আর মশলার রানী হলো এলাচ।

সর্বশেষে মশলা কোন্ কোন্ অংশ থেকে সংগৃহীত হয় সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক্।

পাতা থেকে যেসব মশলা আহরিত হয় তার মধ্যে তেজপাতা, পুঁদিনাপাতা, মারোয়া; ফুল থেকে সংগৃহীত হয় লবঙ্গ জাফ্রন প্রভৃতি; লবঙ্গ, এলাচ, লঙ্কার জন্ম ফল থেকে; বীজ থেকে আহরিত হয় মৌরি, জিরা, ধনে প্রভৃতির মতো মশলা। বিশেষ কাণ্ড থেকে আসে আদা, হলুদ, ছাল থেকে আসে দারুচিনি, স্ফীত কন্দ থেকে রসুন, পেঁয়াজের মতো অতি আদরের মশলাপাতি সংগৃহীত হয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই সব মশলার চাষ শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। মশলার গুণগত মান যাতে বাড়ে, উৎপাদন যাতে বাড়ে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আজকাল এদের গবেষণাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া।

টমাস আলভা এডিসন

পথিক মণ্ডল

এডিসনের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। সুইচ টিপে আলো জ্বালানো, পর্দায় রঙিন ছবি দেখা, গ্রামোফোন রেকর্ডে গান শোনা—এই সব তাঁরই আবিষ্কার।

লক্ষ লক্ষ ডলারের মালিক হয়েও এডিসন সাধারণ মানুষের মতো দিন কাটাতেন। কোট প্যাণ্ট পরেই নিজের ঘরটিতে তিনি ঘুমুতেন। জামাকাপড় খুলে শুলে রাত্তিরে ঘুম আসবে না, তিনি বলতেন। ঘরের মেঝেতে থুথু ফেলা তাঁর ভারী বদ অভ্যেস ছিল। সহকারীদের প্রতি তিনি প্রায়ই মুখ খারাপ করতেন। নিজেকে জাহির করার দিকে তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি আবিষ্কর্তাদের মধ্যে এডিসনই শ্রেষ্ঠ।

টমাস আলভা এডিসন

আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন ট্রান্সমিটার ও রিসিভার তৈরী করলেও সহজে বহুদূর পর্যন্ত কথা বলার ব্যবস্থা এডিসনই করে যান। তিনিই প্রথম মাউথপিসে 'হ্যালো' বলে চিৎকার করেছিলেন। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে তাঁর একমাত্র আবিষ্কার—'এডিসন এফেক্ট'। অর্থাৎ উত্তপ্ত বিদ্যুৎ পরিবর্তন থেকে ইলেকট্রনের উৎক্ষেপণ, কালক্রমে ইলেকট্রনিকস শিল্প সৃষ্টির সূত্রপাত করে যা থেকে রেডিও টেলিভিশন, কম্প্যুটার, রাডার এবং ঐ ধরনের বিস্ময়কর যন্ত্রের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। বাস্তবিকই এডিসনের আবিষ্কারের সংখ্যা অসংখ্য। মাত্র পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে তাঁর নামে এক হাজার তিরানব্বইটি জিনিস পেটেন্ট হিসেবে আমেরিকার বাজারে চালু হয়।

এডিসনই প্রথম ব্যবহারিক বৈদ্যুতিক আলোর উদ্ভাবন করেন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে কম খরচে তিনিই প্রথম সেই আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। 1879 সালের 21 অক্টোবর মিশিগানের ডিয়ার বনের গ্রীণফিলড গ্রামের একটি বাড়িতে বাল্বের আলো জ্বালানোর প্রথম সফল দিন। ঐ দিনটি সবার কাছেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এডিসন রাতে তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমুতেন না। আর জামা-কাপড় বদলাবার দিকে কোন নজরই থাকত না। এমন কি স্নান করাও তিনি পছন্দ করতেন না। দিনের পর দিন চপ আর চা খেয়ে তিনি স্বাস্থ্য খারাপ করে ফেলেন। দুই স্ত্রী ও ছটি সন্তানের প্রতিও তিনি ঠিক মতো নজর দিতেন না। বাড়িতে খুব কম সময়ই থাকতেন। ল্যাবরেটরিতে রাত কাটাতে বেশি পছন্দ করতেন।

অত্যধিক শারীরিক স্থূলতার দরুন তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে জানা যায় তাঁদের বিবাহিত জীবনে প্রেমের প্রাধান্য ছিল না। তাঁর অনেক আবিষ্কার কল্যাণকর হলেও তাঁর সমস্ত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার পেছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল অর্থকরী। এডিসন পরে বলেছিলেন, যা বিক্রি হবে না তা আমি উদ্ভাবন করব না। বিক্রিই যে কোন জিনিসের প্রয়োজনের প্রমাণ আর প্রয়োজনই আনে সাফল্য।

1931 সালে মৃত্যুর সময় এডিসন বেশি সম্পত্তি রেখে যেতে পারেন নি, মাত্র বিশ লক্ষ ডলার। বেশি অর্থ রেখে যেতে না পারার একটিই কারণ অমিতব্যয়িতা। ল্যাবরেটরির জন্য তিনি যথেষ্ট ব্যয় করে গেছেন। পৃথিবীর সব চাইতে দামী বস্তু প্লাটিনাম তিনি পাউণ্ডের মাপে অর্ডার দিতেন। আধুনিক গবেষণাগার তিনিই প্রথম তৈরী করেন। এডিসন মানুষের অজান্তে আরো কতই না আবিষ্কার করেছিলেন তা সবই আমরা হয়তো জানি না। তাঁর ছন্নছাড়া জীবন আমাদের আজও বড় ভাবায়। রবার্ট কোণ্ট তাঁর রচিত এডিসনের জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'এডিসনের মন বিভাজমান অ্যামিবার মতো একটি আইডিয়া থেকে অনেক নতুন ধারণার জন্ম দিত, তারপর সেই সব সৃষ্টি ও প্রয়াসকে পৃথকভাবে রূপায়িত করত। তাঁর আত্মবিশ্বাসই ছিল সীমাহীন। কোন একটা জিনিস উদ্ভাবন করা সম্ভব নয় বলে সমসাময়িক অভিমত যদি ঘোষণা করা হত তা হলে তা এডিসনকে আরো বেশি নিশ্চিত করত যে ঐ জিনিসটা উদ্ভাবন করা সম্ভব। প্রথমে তিনি খোলা মন নিয়ে এগোতেন। কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর তিনি আর কোন দিকে ফিরে তাকাতেন না।'

নিউ ব্যারাকপুর, 24 পরগনা

নিত্যব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্য

অমরনাথ রায়

বিনা নুনে রান্না-খাবার খাওয়া শাস্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমরা খাবারের সঙ্গে যে নুন খাই, রসায়ন বিজ্ঞানে তার নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড।

সাবান নইলে ময়লা জামা-কাপড় কাচা যায় না। সাবান তৈরি করতে হলে যে কটি রাসায়নিক দ্রব্য চাই-ই কষ্টিক সোডা তার মধ্যে অন্যতম। কষ্টিক সোডার রাসায়নিক নাম সোডিয়াম-হাইড্রক্সাইড।

কষ্টিক সোডা ও কাপড় কাচার সোডা কিন্তু এক জিনিস নয়। কাপড় কাচার জন্যে যে সোডা আমরা ব্যবহার করি, তা হলো সোডিয়াম কার্বনেট।

সূতী কাপড়ে অবাঞ্ছিত রঙ লেগে গেলে তা দূর করার জন্যে দরকার ব্লিচিং পাউডার। ব্লিচিং 'পাউডারের আর একটি ভাল গুণ আছে। এটি জীবাণুনাশক। বিশেষ করে পানীয় জলকে জীবাণুমুক্ত করতে এই রাসায়নিক দ্রব্যটি ব্যবহার করা হয়। রসায়নের ভাষায় ব্লিচিং পাউডার হলো 'ক্যালসিয়াম ক্লোরো-হাইপো ক্লোরাইট।'

পানে একটু চুন না দিলে চলে না। আবার চুনকাম করলেই ঘরের সৌন্দর্যই শুধু বাড়ে না, ঘর জীবাণুমুক্তও হয়। পান খাওয়ার চুন আর ঘর চুনকাম করার চুন একই জিনিস। উভয়েই কলিচুন, রসায়নের ভাষায় 'ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড।'

বই বাঁধানোর কাজে যে ময়দার আঠা ব্যবহার করা হয় তার সঙ্গে একটু তুঁতে মিশিয়ে নেওয়া হয়। তুঁতের কীটনাশক ধর্ম আছে বলেই এটা করা হয়। তুঁতে রসায়ন বিজ্ঞানীদের কাছে 'সোদক কপার সালফেট' নামে পরিচিত।

মানুষের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে যেমন নানা রকম পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, উদ্ভিদের বেলাতেও তাই। পুষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক নানারকম উপাদান সমন্বিত খাদ্য আমরা জমিতে সার হিসাবে প্রয়োগ করে থাকি।

'অ্যামোনিয়াম সালফেট' জমির পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট রাসায়নিক সার।

পেট্রোল না পেলে আধুনিক কালের যানবাহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মোটরগাড়ি, স্কুটার, উড়োজাহাজ ইত্যাদি অচল হয়ে যায়।

কেরোসিন তেল না হলে গ্রামগুলি তো বটেই, এমনকি শহরগুলিও লোডশেডিংএর সময় নিষ্প্রদীপ হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়। জ্বালানী হিসাবেও কেরোসিন তেল আমাদের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য। পেট্রোল ও কেরোসিন উভয়েরই উৎস এক পেট্রোলিয়ম বা খনিজ তেল। 'মেথিলেটেড স্পিরিট না পেলে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বলবে না, রঙ ও বার্নিশ শিল্প অচল হয়ে পড়বে। ইথাইল অ্যালকোহলের সঙ্গে পরিমিত মিথাইল অ্যালকোহল, সামান্য পিরিডিন ও ন্যাপথা মিশিয়ে তৈরি করে নেওয়া হয় 'মেথিলেটেড স্পিরিট'।

এতক্ষণ যে সব রাসায়নিক দ্রব্যের কথা তোমাদের বললাম, সেগুলির কথা তোমরা ভৌতবিজ্ঞানের বইতে পড়েছ। এদের বিষয় অনেক কিছুই জেনেছ। কিন্তু কতটা জেনেছ বা শিখেছ তা নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে নিজেই যাচাই করে নিতে পারবে।

1. কষ্টিক সোডার আণবিক সংকেত কোন্‌টি ?
   (ক) $Na_2CO_3, 10H_2O$
   (খ) $NaOH$
   (গ) $NaHCO_3$
2. কপার সালফেটের একটি অণুতে ক'টি কেলাস-জল অণু আছে ?
   (ক) 5
   (খ) 10
   (গ) 7
3. 'খাদ্য লবণ'-এর ক্ষেত্রে নিচের কোন্ উক্তিটি সত্য ?
   (ক) এটি একটি জৈব যৌগ।
   (খ) এটি উদ্বায়ী কঠিন পদার্থ।
   (গ) এটি একটি শমিত লবণ।
4. সাধারণ লবণে অবিশুদ্ধি হিসাবে কোন্ দু'টি উদগ্রাহী পদার্থ থাকে ?
   (ক) ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড।

(খ) ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট।
(গ) ফেরিক ক্লোরাইড ও কিউপ্রাস ক্লোরাইড।

5. পানীয় জলকে জীবাণুমুক্ত করতে কোন্‌টি ব্যবহৃত হয়?
(ক) কপার সালফেট।
(খ) ব্লিচিং পাউডার।
(গ) সোডিয়াম কার্বনেট।

6. নিচের কোন্ যৌগটি তড়িৎবিশ্লেষ্য?
(ক) ব্লিচিং পাউডার।
(খ) কলিচুন।
(গ) কস্টিক সোডা।

7. সত্য উক্তিটির পাশে √ চিহ্ন বসাও।
(ক) পোড়া চুনকে জলে ফেললে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়।
(খ) পোড়া চুনকে জলে ফেললে দ্রবণটি শীতল হয়?
(গ) পোড়া চুনকে জলে ফেললে দ্রবণের উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হয় না।

8. সাধারণ হিমমিশ্রণ তৈরি করতে বরফ ছাড়া নিচের কোন্ রাসায়নিক দ্রব্যটির প্রয়োজন হয়?
(ক) সোডিয়াম ক্লোরাইড।
(খ) সোডিয়াম কার্বনেট।
(গ) কলিচুন।

9. নিচের কোন্ পদার্থটি সাবান প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয় না?
(ক) কস্টিক সোডা।
(খ) সোডিয়াম কার্বনেট।
(গ) উদ্ভিজ্জ তেল।

10. মেথিলেটেড স্পিরিটে যে দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থটি মেশানো হয়, তার নাম কি?
(ক) রেকটিফায়েড স্পিরিট।
(খ) মিথাইল অ্যালকোহল।
(গ) পিরিডিন।

11: 'ড্রাই ওয়াশ'-এর কাজে কোন্‌টি ব্যবহৃত হয়?
(ক) সাবান।
(খ) পেট্রোল।
(গ) কেরোসিন।

12. নিচের অ্যাসিডগুলির মধ্যে কোন্‌টি উচ্চ আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন?
(ক) নাইট্রিক অ্যাসিড।
(খ) সালফিউরিক অ্যাসিড।
(গ) স্টিয়ারিক অ্যাসিড।

13. নিচের কোন্‌টি উত্তম নাইট্রোজেনঘটিত সার?
(ক) অ্যামোনিয়াম সালফেট।
(খ) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড।
(গ) অ্যামোনিয়াম কার্বনেট।

14. অ্যামোনিয়া গ্যাসকে শুষ্ক করতে কোন্ যৌগটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) পোড়া চুন।
(খ) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড।
(গ) ফসফরাস পেন্টক্সাইড।

15, অনার্দ্র কপার সালফেটের রং কেমন?
(ক) নীল।
(খ) সাদা।
(গ) সবুজ।

16. ইঁট-পাথরের গাঁথুনির মশলা তৈরি করতে কোন্‌টি ব্যবহৃত হয়?
(ক) কস্টিক সোডা।
(খ) সোডিয়াম কার্বনেট।
(গ) কলিচুন।

17. সাবান প্রস্তুত করার সময় উপজাত পদার্থরূপে কোন্‌টি পাওয়া যায়?
(ক) গ্লিসারিন।
(খ) ওলেইক অ্যাসিড।
(গ) কলিচুন।

18, নিচের কোন্‌টি উদ্‌ত্যাগী কেলাস?
(ক) কপার সালফেট।
(খ) সোডিয়াম কার্বনেট।
(গ) সোডিয়াম ক্লোরাইড।

19. নিচের কোন্ যৌগটিতে কেলাস-জল থাকে না?
(ক) কলিচুন।
(খ) তুঁতে।
(গ) সোডিয়াম কার্বনেট।

20, পেট্রোলিয়ম শোধনে নিচের কোন্ যৌগটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) সোডিয়াম কার্বনেট।
(খ) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড।
(গ) ব্লিচিং পাউডার।

21, জলের খরতা দূর করতে কোন্ যৌগটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) সোডিয়াম কার্বনেট।

(খ) কস্টিক সোডা।

(গ) চুন।

22. মশার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করতে জলাশয়ে কোন্‌টি ছড়িয়ে দেওয়া হয়?

(ক) ব্লিচিং পাউডার।

(খ) কলিচুন।

(গ) কেরোসিন।

23. লাক্ষার দ্রাবক কোন্‌টি?

(ক) কেরোসিন।

(খ) জল।

(গ) মেথিলেটেড স্পিরিট।

24. মেথিলেটেড স্পিরিটকে বিষাক্ত করা হয় কি দিয়ে?

(ক) মিথাইল অ্যালকোহল।

(খ) ইথাইল অ্যালকোহল।

(গ) তুঁতের দ্রবণ।

25, কাঠ সংরক্ষণে নিচের কোন্ যৌগটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) চুন।

(খ) ব্লিচিং পাউডার।

(গ) তুঁতে।

উত্তর

(1) খ, (2) ক, (3) গ, (4) ক, (5) খ, (6) গ, (7) ক, (8) ক, (9) খ, (10) গ, (11) খ, (12) গ, (13) ক, (14) ক, (15) খ, (16) গ, (17) ক, (18) খ, (19) ক, (20) খ, (21) ক, (22) গ, (23) গ, (24) ক, (25) গ।

ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর

জ্ঞান বিজ্ঞানের বই

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৬.

শ্যাম লয়েড ও লুইস ক্যারোলের

অঙ্ক ও ধাঁধার খেলা ১০.

সম্পাদনা করেছেন : সিদ্ধার্থ ঘোষ

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

পশুপাখী কীটপতঙ্গ ৮·০০

অমরনাথ রায়

জ্ঞানবিজ্ঞানের মজার খেলা ৫.

অরূপরতন ভট্টাচার্য

রোবোট এল কেমন করে ৬.

অমরনাথ রায়

সংখ্যা নিয়ে খেলা ৮·০০

সমরজিৎ কর

সমুদ্রের সম্পদ ৮.

অমরনাথ রায়

সায়েন্স ক্যুইজ ১০.

সমরজিৎ কর

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১৫.

সিদ্ধার্থ ঘোষ

অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ৬০০

ভিপির জন্য অগ্রিম পাঠাতে হবে

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

নীলকণ্ঠ পাখিদের কথা

অজয় হোম

নীলকণ্ঠ বংশ

নীলকণ্ঠ বর্গের অন্যতম বংশ নীলকণ্ঠর (কেরোসিইদি) চঞ্চু বড়ো এবং কাকের সঙ্গে আকারে সাদৃশ্য দেখা যায়। উপরের চঞ্চু গোলাকার এবং একদম ডগার তলায় একটু খাঁজ কাটা। চক্ষুর গোড়ায় নাকের ছিদ্র। বাইরের ও মাঝের আঙুল গোড়ার প্রান্তে যুক্ত। ভিতরের এবং মাঝের আঙুল প্রান্তদেশের গাঁটের কাছে জোড়া। শৈশবাবস্থা থেকে স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। এই বংশে ভারতে দুটি গণ—নীলকণ্ঠ (কোরাসিয়াস) এবং হেমতুও (ইউরাইসটোমাস)।

ছুটির দিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। বাঁদিকে বাগান-বিলাস বা বোগেনভিলিয়ার ঝাড়। সামনে খানিকটা গিয়ে রাস্তা। রাস্তার পর কিছুটা খোলা জায়গা। তারপর রেল লাইন, ইলেকট্রিকের তার, টেলিগ্রাফের পোস্ট।

শীতের শেষ বলাটা ঠিক নয়। কারণ ফাগুনের মাঝামাঝি হলেও শীতের রেশটা আছে। অন্তত সকাল-বেলা সেটা অনুভব করা যায়। বসন্ত ঋতুর আগমন বার্তা জানান দেবারও উপক্রম করছেন প্রকৃতিদেবী। এই রকম এক সন্ধিকাল। টেলিগ্রাফের পোস্টের উপর আমার দিকে ফিরে স্থির হয়ে বসে আছে একটা পাখি। একটু গায়ে গতরে। দূর থেকে মনে হচ্ছে বুকটা যেন খয়েরী, তলাটা ফিকে নীল।

বেশ চুপ করে বসে ধ্যান করছিল। হঠাৎ ঝুপ করে নিচে নামলো প্রায় প্যারাশুটারের কায়দায়। এই সময় দেখলাম ডানায় আর লেজে কী অপরূপ নীলের বাহার! এই নীলকে ইংরেজিতে বলে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ ব্লু। পাখিটা আড়ালে পড়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি না। বুঝতে পারছি ঘাসফড়িং বা অন্য কোনও পোকা খেতে নেমেছে।

অল্প পরেই মাটি থেকে উড়ে আবার বসলো স্থির হয়ে যেখানে বসেছিল সেখানে। দৃষ্টি তার মাটির দিকে। ঠিক যেমন জ্ঞাতিভাই মাছরাঙা তাকিয়ে থাকে জলের দিকে! হঠাৎ তীব্র কর্কশ এক ডাক—'ট্‌জক' দিয়ে উড়লো উপর দিকে। বাতাসে ভর দিয়ে সোজা মুখটি নীল আকাশের দিকে তুলে নীলের বাহার উড়িয়ে উপরে উঠে গিয়ে খেলো এক ডিগবাজি। অপরূপ পাখিটার উৎপতন ভঙ্গী। আবার ডাক দিল কর্কশ 'ট্‌জক ...ট্‌জক...কাক্‌...কাক্‌...কাক্‌...কাক্‌...'।

পাখিটা নীলকণ্ঠ বংশের এবং ওই নামের এক প্রজাতি। নাম—নীলকণ্ঠ (কোরাসিয়াস বেংঘলেনসিস)। হিন্দী—সবজক্‌, নীলকন্‌ঠ। ইংরেজি—ইণ্ডিয়ান রোলার, ব্লু জে। নীলকণ্ঠ গণে (কোরাসিয়াস) 2টি প্রজাতি। অপর প্রজাতি—বিলিতি নীলকণ্ঠ, কাশ্মীরী নীলকণ্ঠ (কো গ্যাররুলাস)। ইংরেজি—ইওরোপীয়ান রোলার। বাস করে ইওরোপ, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, তুর্কিস্তান, ইরান, বেলুচিস্তান, গিলগিট ও কাশ্মীর। পরিযায়ী হয় রাজস্থান, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, পাকিস্তান থেকে আরবে।

নীলকণ্ঠ

নীলকণ্ঠ লম্বায় 13 ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথার চাঁদি নীলচে সবুজ। ঘাড় গাঢ় খয়েরী। উপরের পালক নিষ্প্রভ সবজেটে-পাটকিল; বস্তি প্রদেশের কাছে লেজের গোড়ায় নীলের ছোপ। ডানা নীল আর সবুজ মিশানো, ওড়ার পালক গাঢ় বেগুনি-নীল, তার উপর একটি ফিকে নীলের পটি। লেজ গাঢ় নীল, তার উপর ফিকে নীলের পটি, কিন্তু মাঝখানে এক জোড়া পালক নিষ্প্রভ সবজেটে। মাথার দু'পাশ ও গলা বেগুনি-খয়েরি, তার উপর

সাদার ছিট। বুক ঈষৎ গোলাপী আভাযুক্ত খয়েরি, তার উপর সাদাটে ছিট, বাকি তলার পালক ফিকে নীল। কনীনিকা ধূসর- পাটকিলে; চোখের চারপাশ গোলাকার পালকহীন স্থান সবজেটে-হলুদ। চঞ্চু কালচে-পাটকিলে। পা পাটকিলে-হলুদ।

বাসস্থান—পূর্ব আরব, ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, ভারত থেকে পুবে ইন্দোচীন ও তৎসংলগ্ন স্থান। ভারতে 3টি উপজাতি। প্রথম উপজাতি (কো বেং বেংঘলেনসিস)—পাকিস্তান, ভারতে সর্বত্র 3 হাজার ফুটের ভিতর এবং বাংলাদেশ। দ্বিতীয় 'দক্ষিণী নীলকণ্ঠ' (কো বেং ইণ্ডিকা)—উপদ্বীপাত্মক ভারত ও সিংহলে 4 হাজার ফুটের মধ্যে। তৃতীয় 'বর্মী নীলকণ্ঠ' (কো বেং অ্যাফিনিস)—সিকিম, ডুয়ার্স, ভুটান ডুয়ার্স, উত্তরবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশে 2 হাজার ফুটের ভিতর। অপর গণ হেমতুণ্ড-এ একটিমাত্র প্রজাতি; নাম—ডলার পাখি (ইউরাইসটোমাস ওরিয়েণ্টালিস)। ইংরেজি—ব্রডবিলড্ রোলার। বাসস্থান—হিমালয়ের পাদদেশ ধরে কুমায়ুন, নেপাল, উত্তরবঙ্গ, আসাম ও বাংলাদেশে 3 হাজার ফুটের ভিতর এবং পশ্চিম মাদ্রাজ, পশ্চিম মহীশূর, কেরালা, সিংহল ও দক্ষিণ আন্দামানে চিরসবুজ গভীর জঙ্গলে।

খাদ্য—নানাবিধ ছোটোবড়ো কৃষির অপকারী কীটপতঙ্গ এবং ফড়িং, উচ্চিংড়ে, ঝিঁঝিঁপোকা, ঘুরঘুরে, গুবরে, শুঁয়োপোকা এবং এদের শূককীট। সময়বিশেষে টিকটিকি, গিরগিটি, ব্যাঙ, মেঠো ইদুঁর, বিছে ও ছোটো সাপ। ক্বচিৎ শূন্যে মথ ও ডানাওঠা পিঁপড়ে।

স্বভাব—নীলকণ্ঠের কণ্ঠে কোথাও নীল না থাকাতে সকলেরই নামটার জন্যে কেমন একটা ধাঁধাঁ লাগে। কেবল মনে প্রশ্ন জাগে, এই নাম কেন হলো? আমারও তাই হত। পরে দেখলাম নামটা সার্থক, কারণ দেবাদিদেব মহাদেবের মতো কৃষির পক্ষে হলাহলসম কীটপতঙ্গাদি উদরসাৎ করে অবলীলাক্রমে। একারণে নীলকণ্ঠ অবধ্য। শিব নীলকণ্ঠ বলে ভারতের কোনো কোনো স্থানে দশেরা বা দশহরার সময় এবং দুই বাংলায় দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন বা ভাসানের মুহূর্তে কোথাও এই পাখি উৎসবের আগে ধরে বা কিনে খাঁচায় রেখে ওই সময়ে ছেড়ে দেওয়ার রীতি আছে। দক্ষিণ ভারতে তেলেগু-ভাষীরা বলে পালুপিট্টা' অর্থাৎ দুধপাখি। তাদের বিশ্বাস গরুর দুধ কমে গেলে নীলকণ্ঠের পালক কয়েকটা জাবনার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে গরু নাকি প্রায় দ্বিগুণ দুধ দেয়।

নীলকণ্ঠকে দেখা যায় খোলামেলা জায়গায় এবং খেতের আশেপাশে। ঘন জঙ্গল খুব বেশি পছন্দ করে না। প্রজননকাল ছাড়া অন্য সময়ে একাকী বিচরণ করতেই দেখা যায়। যে কোনও গাঁয়ে বা শহরতলিতে এদের দেখা না যাওয়াটাই আশ্চর্যের। দেখা যাবে বসে আছে প্রাচীন কোনও গাছের মরা ডালে, কুয়োর লাটাখাম্বার মাথায়, ভাঙা বাড়ির ছাদ বা কার্নিসে, টেলিগ্রাফ বা ইলেকট্রিকের তার বা পোস্টে। এও যদি না জোটে, তবে দেখা যায় পাথরের চাংড়া বা ঘন কাঁটাঝোপের উপরে। লেজটা উঠছে নামছে প্রায় খঞ্জনের মতো, তবে খুব ধীরে ধীরে। কিন্তু সবসময়ে বড়ো বড়ো চোখ দুটো জমির উপর প্রতিটি দিকে ঘুরছে। দেখছে কোথায় একটা ঘাসফড়িং নড়লো ঘাসের ডগার উপর। মাটি ফুঁড়ে ওটা কি বার হলো? ঝিঁঝিঁ না মেঠো ইদুঁর? ব্যস, ঝাঁপিয়ে পড়লো নীলকণ্ঠ ঠিক তার উপরে। ওখানেই মাটিতে বসে ভোজন-পর্ব সেরে স্বস্থানে ফিরে আবার শিকারের আশায় অপেক্ষা করে। কোনও কারণে বাধা পেলে অন্যত্র গিয়ে বসে এবং প্রায়ই দেখা যায় সেটা প্রথম বসার কাছাকাছি।

একবার বিহারে ছোটোনাগপুরের গিরিডিতে নজরে পড়েছিল রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মতো নীলকণ্ঠ ও কোটরে পেঁচার একাঙ্কিকা। সূর্য অস্ত গেছে। পশ্চিম আকাশ গোধূলির আলোয় লাল। সন্ধ্যা হব হব। কিছুটা আলো আছে। হর্তুকীগাছের পাতাঝরা এক ডালে নীলকণ্ঠ বসে লেজ দোলাচ্ছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। এই অবসরের বাগানে ফুলগাছের গোড়া এবং ঘাসের চাপড়ার ফাঁক থেকে ঝিঁঝিঁপোকারা বার হওয়া শুরু করতেই নীল ডানা উড়িয়ে ঝপ করে পড়ে একটিকে মুখে পুরলো। যতক্ষণ আলো ছিল ততক্ষণ নীলকণ্ঠ একাই মঞ্চ মাতিয়ে তার অতীব সুখাদ্য খেয়ে গেল একের পর এক। রোয়াকে ইজিচেয়ারে বসে এই দৃশ্য দেখলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। শেষ আলো যখন চলে গেল, দৃষ্টি আর যখন চলে না নীলকণ্ঠ তখন উড়ে চলে গেল রাস্তা পার হয়ে আমবাগানের ভিতরে।

রঙ্গমঞ্চের নায়ক চলে যাওয়াতে ঝিঁঝিঁপোকারা মনের আনন্দে মাটি ফুঁড়ে বার হতে লাগলো নিশ্চয়ই। কারণ

দেখতে পাচ্ছি নে কিছুই। হঠাৎ পাশের বাড়ির ঝাঁকড়া মহুয়াগাছের ভিতর থেকে উড়ে এলো দস্যু এক কোটরে পেঁচা। রঙ্গমঞ্চ আবার মাতিয়ে তুললো টপাপট ঝিঁঝিঁ-গুলোকে ধরে। তার ডাকে মহুয়াপাতার আড়াল থেকে নেমে এলো সঙ্গিনী। দুজনের ওড়া আর খাওয়া দেখলাম যবনিকা পর্যন্ত।

নীলকণ্ঠের ওড়ার কায়দাটা অদ্ভুত। যখন বসে থাকে, মোটামুটি ভারিককী চেহারাটা অসুন্দরই লাগে। ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেজ আর ডানার সৌন্দর্য মানুষকে আকৃষ্ট না করে পারে না। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই তার জবুথবু ভাবটা যেন দূর হয়ে যায়। শূন্যমার্গে কায়দার ওড়াটা কেবলমাত্র দয়িতার মনোরঞ্জনের জন্যে নয়, নিজের আনন্দেও। আকাশে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দোল খেতে খেতে ডিভবাজি খায় কতভাবে। সোজা মুখ তুলে উপরে উঠে আবার মুখ নিচু করে পড়ে। যাকে বলে 'নোজ ডাইভ'। ডিগবাজি—'লুপ ইন দ্য লুপ', পাশে গড়িয়ে কেমন ঘুরে যাওয়া। সবসময়ে মুখে আওয়াজ 'ট্‌জক'। সূর্যের কিরণে নীলের ছটা অপরূপ ফুটে ওঠে। কখনও কখনও জোড়ায় যখন সার্কাসের ট্রাপিজের খেলা দেখায় তখন সে দৃশ্য হয় অবর্ণনীয়!

নীলকণ্ঠের প্রজননকাল মার্চ থেকে জুলাই। বাসা বানায় কোনো মরা গাছের কাণ্ড বা ডালের গায়ে, প্রাকৃতিক কারণে গর্তে, কাঠঠোকরার পরিত্যক্ত কোটরে অথবা নেড়া খেজুর নারকেল বা তালগাছের মাথায় গর্তের ভিতর ঘাস, খড়, ছেঁড়া নেকড়া ও আবর্জনা দিয়ে। ভাঙা বাড়ির কার্নিসের তলায় বা দেওয়ালের গায়ে গর্তেও বাসা বানাতে দেখা যায়। কোনওরকমে উপকরণগুলি গর্তের মধ্যে রাখে। ডিম পাড়ে 3-4টি শক্ত খোলার চকচকে ধবধবে সাদা। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই তা দেয় এবং ছানাদের খাওয়ায়। ডিম ফুটে ছানা বার হতে 17 থেকে 19 দিন সময় নেয়। ডিমের মাপ—লম্বায় 1·30, চওড়ায় 1·05 ইঞ্চি।

8/2, ডঃ বীরেশ গুহ স্ট্রীট, কলিকাতা-17

বিশিষ্ট পক্ষিবিজ্ঞানী অজয় হোম প্রণীত

বাংলার পাখি

চেনা-অচেনা প্রায় ১০০০ পাখির সচিত্র বিবরণ

প্রচ্ছদ এঁকেছেন

সত্যজিৎ রায়

এখন আবার পাওয়া যাচ্ছে। দাম—২০·০০ টাকা।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ॥ ৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

পড়াশোনা

জীবন-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ-12

তারকমোহন দাস

জীবজগৎ সম্পর্কে কিছু জানতে হলে প্রথমেই উদ্ভিদ বা প্রাণীটিকে নিজের চোখে বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে হয়, তার বৈশিষ্ট্যগুলি সতর্কভাবে লক্ষ্য করতে হয়। এই বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করেই প্রাণিজগৎকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। আমরা চারপাশে যে অসংখ্য প্রাণী দেখি তাদের দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন যাদের মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া আছে তাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। যেমন মানুষ, গরু, ঘোড়া, মাছ, পাখি, সাপ ইত্যাদি। যাদের মেরুদণ্ড নেই তাদের অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। যেমন কেঁচো, ফড়িং, চিংড়ি, শামুক, আরশোলা, প্রজাপতি, পিঁপড়ে ইত্যাদি। পৃথিবীতে প্রায় দশ লক্ষ রকম প্রাণী আছে, তার মধ্যে মেরুদণ্ডী প্রাণীর সংখ্যা প্রায় 54 হাজার; বাকী সব অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

পৃথিবীর জীবনের ইতিহাসে মনে করা হয় এই অমেরুদণ্ডী প্রাণীরাই এসেছিল সবুজ উদ্ভিদের সঙ্গে সঙ্গে বা তার কিছুকাল পরেই। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা এসেছে অনেক পরে, অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্য থেকেই ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হয়ে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের গঠন তাই খুবই উন্নত। দেহের মধ্যে একটি মেরুদণ্ড এবং শক্ত হাড়ের কাঠামো থাকায় মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নিজেদের দেহের ভার বহন, ভেতরের কোমল অংশগুলিকে রক্ষা এবং দ্রুত চলা-ফেরার খুবই সুবিধা হয়। আমাদের দেহের মধ্যে যদি এই অস্থিময় কাঠামোটি না থাকত তা হলে আমরা এক তাল মাংসপিণ্ডে পরিণত হতাম। এই মাংসপিণ্ডের পক্ষে দেহের নির্দিষ্ট গঠনদানে সহায়তা করা, দেহকে রক্ষা করা অথবা দ্রুত চলাফেরা করতে সাহায্য করা খুবই শক্ত হত। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্ক এবং চোখ, নাক, কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গঠন অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের থেকে অনেক উন্নত ও জটিল। তাদের বুদ্ধিও তাই বেশি।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের মধ্যে হাড়ের কংকাল না থাকলেও অনেকের দেহের ওপর একটা শক্ত খোলস বা শক্ত আবরণী থাকে। যেমন শামুক, ঝিনুক, প্রবাল, কাঁকড়া, চিংড়ি, নানা জাতের পতঙ্গ ইত্যাদি। এই শক্ত আবরণীটি বেশ ভারী ও অবিভক্ত একটি খোলসের মতো হতে পারে। যেমন শঙ্খ, প্রবাল, কড়ি ইত্যাদি। আবার খোলসটি দুই অংশে বিভক্ত হতে পারে। যেমন ঝিনুক, কিংবা খুব হাল্কা অঙ্গুরীর মতো অনেকগুলি অংশে বিভক্ত হতে পারে, নড়াচড়ার তাতে সুবিধা হয়। যেমন বিছা, ফড়িং, চিংড়ি ইত্যাদির দেহ। খোলসের মধ্যে নরম দেহটি থাকায় যেমন কিছুটা সুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে তেমনি বিস্তর। দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের বার বার খোলস বদলাবার দরবার হয়। কেননা খোলসটি মৃত জড় পদার্থে তৈরী, দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়ে না। দেহের আকার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো খোলসটি অবশাই ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হাড়ের কংকালটি দেহের মধ্যে থাকায় সে অসুবিধা হয় না। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হাড়গুলি জীবিত কোষে তৈরী, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের বৃদ্ধি হয়, হাড়ের মধ্যকার কোষগুলি বিপাক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, মজ্জার মধ্যে রক্ত তৈরী হয়। খাদ্যের ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি উপাদানগুলি হাড়ের মধ্যে জমা হয়, এখান থেকে খরচও হয়। পৃথিবীর সব উন্নত ও বিরাটকায় প্রাণী, যেমন মানুষ, হাতি, তিমি সকলেই কংকাল দেহের মধ্যেই থাকে। খোলসযুক্ত প্রাণীরা আকারে সেই তুলনায় খুবই ছোট, কিন্তু তাই বলে তারা যে আমাদের পৃথিবীর আব-হাওয়ার পক্ষে বেমানান বা অনুপযুক্ত তা নয়। পৃথিবীতে খোলসযুক্ত প্রাণীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

মেরুদণ্ডী প্রাণীরা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ হলেও রূপে, রঙে, বৈচিত্র্যে সারা পৃথিবীকে ভরিয়ে রেখেছে। দেহের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ, উভচর ও মৎস্য এই পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, তা তোমরা জান। এদের মধ্যে স্তন্যপায়ী বা ম্যামেলরাই সব চেয়ে উন্নত প্রাণী গোষ্ঠী। গরু, ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল, বানর এরা স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের দেহে লোম, স্তনগ্রন্থি ও বহিঃকর্ণ আছে। এরা সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যদান করে, সন্তানদের কিছুকাল সযত্নে লালন-পালন করে। তাই এদের স্তন্যপায়ী প্রাণী বলে।

এরা উষ্ণ রক্তের মেরুদণ্ডী প্রাণী। মানুষও একটি স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী প্রাণী। মানুষের আধিপত্য আজ সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত, যদিও সবুজ উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করেই তাকে বেঁচে থাকতে হয়। পৃথিবীতে বহু বিচিত্র রকম স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে। প্লাটিপাস একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী, কিন্তু তারা পাখিদের মতো ডিম পাড়ে। বাদুড় ও চামচিকা স্তন্যপায়ী প্রাণী, কিন্তু তারা পাখিদের মতো আকাশে উড়তে পারে। মাছের মতো দেখতে হলেও তিমি আসলে একটি উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী। এরা বাচ্চাদের সযত্নে স্তন্যদান করে লালন পালন করে থাকে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাণী হলো 'নীল তিমি', আকারে প্রায় নব্বই ফুট লম্বা। স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে হাতি আকারে সবচেয়ে বড়।

অন্যান্য প্রাণী থেকে পাখিদের অতি সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। পাখিদের পায়ের কিছু অংশ ছাড়া সমস্ত দেহই পালকে ঢাকা থাকে, এদের একজোড়া ডানা থাকে এবং চোয়ালে কোন দাঁত থাকে না। পাখিদের রক্ত (108°—112°F) মানুষের রক্তের (98·8°F) থেকেও গরম। অনেক প্রজাতির পাখি নির্দিষ্ট ঋতুতে হাজার হাজার কিলোমিটার উড়ে পৃথিবীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে থাকে। আবার ডানা থাকলেও কয়েক প্রজাতির পাখি উড়তে পারে না, যেমন উটপাখি, এমু, পেঙ্গুইন। উটপাখি উড়তে না পারলেও অসম্ভব দ্রুত গতিতে (ঘণ্টায় প্রায় আশী কিলোমিটার) দৌড়তে পারে। প্রাণিজগতে দৌড়বার ক্ষমতা চিতাবাঘের পরই উটপাখির স্থান। পেঙ্গুইনরা উড়তে না পারলেও ডানার সাহায্যে সমুদ্রে চমৎকার সাঁতার কাটতে পারে। এরা সকলেই খোলসযুক্ত ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চা হয়।

সাপ, টিকটিকি, কচ্ছপ, কুমীর প্রভৃতি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরা ঠাণ্ডা রক্তের মেরুদণ্ডী প্রাণী। পরিবেশের যা তাপমাত্রা এদের দেহেরও তাই তাপমাত্রা। এরা চিবিয়ে খেতে পারে না, গিলে খায়। এদের দেহটি একরকম শুকনো আঁশে ঢাকা, থাকে, তবে কচ্ছপ ও কুমীরের দেহ শক্ত বর্ম দিয়ে ঢাকা থাকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই সরীসৃপ জাতীয় ডায়ানোসরদের আকার ছিল অতি বিরাট, প্রায় সত্তর ফুটের মত লম্বা এবং তারা অতি দীর্ঘকাল প্রায় তিন কোটি বছর ধরে দাপটের সঙ্গে পৃথিবীতে রাজত্ব করে গেছে। সরীসৃপরা খোলসযুক্ত ডিম পাড়ে, কিন্তু বাচ্চাদের কোন যত্ন রাখে না।

উভচর প্রাণী বলতে সোনাব্যাঙ কুনো ব্যাঙ সালাম্যাণ্ডার প্রভৃতি প্রাণী বোঝায়—যারা জলে ও স্থলে দু-জায়গাতেই বাস করে। এরাও ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী। এদের গায়ের চামড়া গ্রন্থিযুক্ত, তাতে কোন আঁশ বা লোম থাকে না। ব্যাঙ আমাদের অতি উপকারী প্রাণী, এরা বহুরকম ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশের স্বাস্থ্য ও ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।

পৃথিবীতে বহুরকম মাছ আছে। সমুদ্রবাসী হাঙ্গরও একরকম মাছ। এদের দেহে কাঁটাযুক্ত পাখনা থাকে, এদেরও রক্ত ঠাণ্ডা অর্থাৎ জলের যা তাপমাত্রা এদের দেহেরও তাই তাপমাত্রা। সকল মাছেরই ফুলকো আছে, ফুলকোর সাহায্যে এরা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালায়।

এই সব মেরুদণ্ডী প্রাণী পর্যবেক্ষণ করতে হলে তাদের দেহের গঠন ভাল করে লক্ষ্য করবে। পায়ের নখ, গায়ের লোম বা পালক, কাণের গঠন, মুখ এবং দাঁতের বৈশিষ্ট্য দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, আনুমানিক ওজন ইত্যাদি লিখে রাখবে। তা ছাড়া তারা কি কি খায়, কোথায় থাকে, কিভাবে বাসা তৈরী করে এবং কিভাবে সন্তানদের লালনপালন করে তাও সযত্নে লক্ষ্য করবে। তোমরা নোটবুকে এইসব প্রাণীদের ছবি আঁকবে ও তাদের আচারব্যবহার লিখে রাখবে। ক্যামেরায় বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর ফটো তোলা এবং টেপরেকর্ডে নানারকম পাখির ডাষা, জীবজন্তুর ভাষা রেকর্ড করে রাখা এ দুটি অত্যন্ত আনন্দ দায়ক হবি। আজকাল ছোট ছোট অনেকরকম ক্যামেরা ও টেপ রেকর্ডার পাওয়া যায়। তোমরা নিজেরা কিংবা পাড়ার বিজ্ঞান ক্লাব থেকে যদি এটা শুরু কর, তা হলে একদিন খাঁটি প্রকৃতি-বিজ্ঞানীতে পরিণত হবে। আমি অনেক পাখির ডাকের টেপ করেছি, কাকেরা বিভিন্ন সময় কত বিচিত্র-স্বরে ডাকে। একটি পাখি আবার অন্য পাখির স্বর নকল করে কেমন ডাকে, সে সব পাখীকে কথা বলতে শেখানো হয়েছে—তাদের ডাক টেপ রেকর্ডে খুব চমৎকার আসে। তা ছাড়া নানারকম বিচিত্র জীবজন্তু পুষে খুব কাছ থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। এই বিচিত্র জীবজন্তুর তালিকায় নানারকম পাখি, নানারকম মাছ, কচ্ছপ, বহুরূপী, সাদা ইঁদুর, গিনিপিগ, খরগোস, বাঁদর, বেঁজী, কাঠবিড়ালী, ব্যাঙ প্রভৃতি বহুরকম প্রাণীর নাম করা যেতে পারে। এই ব্যাঙেরা বহুদিন বাঁচে, ব্যাঙ যোগাড় করাও খুব সোজা, ব্যাঙের জিভ উল্টে পতঙ্গ ধরার কৌশলও দেখতে খুব মজার। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে নানারকম প্রজাপতি ও ফড়িং ধরা ও তাদের কি ভাবে সংরক্ষণ করে রাখতে হয় তার কথা গত সংখ্যাতেই উল্লেখ করেছি।

পৃথিবীতে অমেরুদণ্ডী প্রাণীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের মধ্যে বিছা ও কাঁকড়া, চিংড়ি, মশা, মাছি, ফড়িং প্রভৃতি সন্ধিপদ প্রাণীর সংখ্যাই সব থেকে বেশি। প্রায় সাত লক্ষ বাইশ হাজার রকম সন্ধিপদ প্রাণীর কথা এ পর্যন্ত জানা গিয়েছে এবং প্রতিবছরই কিছু কিছু পোকামাকড়ের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হচ্ছে। এদের সকলেরই দেহ অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত এবং তালে থাকে সুরু সুরু কতকগুলি উপাঙ্গ। এই উপাঙ্গগুলি কয়েকটি খণ্ড জুড়ে গঠিত, এইজন্য এদের সন্ধিপদ বা আরথোপোডা প্রাণী বলে। সন্ধিপদ প্রাণীর আর এক বৈশিষ্ট্য হলো এদের চোখ, যা অনেকগুলি চোখের মিলনে তৈরী। এই ধরনের চোখকে বলে পুঞ্জাক্ষি। প্রজাপতি মথ, ফড়িং ছাড়াও তোমার ল্যাবরেটরীর মধ্যে সন্ধিপদ প্রাণীর নমুনা হিসাবে ছোট ছোট চিংড়ি, কাঁকড়া, বিছা, কাঁচের জার বা মুখবড় কাঁচের শিশির মধ্যে 10% ফরমালিন বা স্পিরিটের মধ্যে সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে। জাপানী ছেলেমেয়েরা নানারকম পতঙ্গ পোষে। সেখানে ঘরের মধ্যে জায়গা কম, কুকুর বেড়ালও রাখা যায় না, দোকান থেকেই বাক্সর মধ্যে নানারকম সুন্দর বড়বড় ফড়িং ঝিঁ ঝিঁ পোকা ও অন্যান্য পতঙ্গ কিনতে পাওয়া যায়। কি করে তাদের পুষতে হয়, তাও বলে দেওয়া হয়। অনেক রকম পতঙ্গ আছে ঠিক গাছের পাতার মতো দেখতে অথবা শুকনো ডালের মতো দেখতে। এই ধরনের বিচিত্র সুন্দর পতঙ্গ পেলে তোমাদেরও কি পুষতে ইচ্ছে করে না?

আর একধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণী তোমরা পুষতে পার। তা হলো বাগানের শামুক, একটা জাল ঢাকা বাক্সের মধ্যে একটা ছোটপাত্রে জল রেখে এদের রাখা যেতে পারে। তবে খুব সাবধান—একটু ফাঁক পেলেই এরা পালিয়ে যায়। আমি শুনেছি তিন তলার ছাদ থেকে সিঁড়ি বয়ে বয়ে নেমে আবার পালিয়ে যেতে। এই শামুক, গেঁড়ি, গুগলি, শঙ্খ, ঝিনুক, কড়ির দেহ চুন জাতীয় পদার্থের একটা শক্ত খোলসে ঢাকা থাকে, এরা শম্বুক বা মোলাস্কা গোষ্ঠীর প্রাণী। শামুক ও ঝিনুকের খোলা পুড়িয়ে চুন তৈরী করা হয়। সামুদ্রিক ঝিনুক শুক্তি থেকে মুক্তা পাওয়া যায়। দীঘা ও পুরীর সমুদ্রের তীরে প্রচুর ঝিনুক, শঙ্খ ও কড়ি পাওয়া যায়। তোমার সংগ্রহশালায় এদের বিচিত্র নমুনা অবশ্যই রাখবে।

কেঁচো, জোঁক অমেরুদণ্ডী প্রাণী তোমাদের খুবই পরিচিত। এদের দেহ আংটির মতো অনেকগুলি দেহ-খণ্ড নিয়ে গঠিত। এজন্য এদের অঙ্গুরীশাল বা অ্যানিলিডা প্রাণী বলে। কেঁচো চাষীদের পক্ষে খুব উপকারী। জমির উর্বরা শক্তি বাড়ায় এরা।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে আর দুটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী হলো চ্যাপ্টা কৃমি যেমন ফিতাকৃমি ও যকৃত কৃমি, যাদের গোষ্ঠীর বৈজ্ঞানিক নাম প্ল্যাটিহেলমিনথিস এবং গোলকৃমি, যেমন হুককৃমি এবং ফাইলেরিয়ার কৃমি। এরা সূতার মতো লম্বা ও গোল। এদের গোষ্ঠীর নাম নিমাটহেল-মিনথিস্। এদের অধিকাংশই পরজীবীরূপে মানুষ ও অন্যান্য পশুর দেহের মধ্যে বসবাস করে ও নানারকম ব্যাধির সৃষ্টি করে।

সমুদ্রের নোনা জলে আর এক ধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণী বাস করে, যাদের ত্বক খুব খসখসে এবং তাতে অজস্র ছোট ছোট শক্ত কাঁটা থাকে। সমুদ্রের তারা মাছ এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তোমার সংগ্রহশালায় অবশ্যই এই তারামাছের নমুনা রাখবে। এরা কণ্টকত্বক বা একাইনো-ডারমাটা প্রাণি-গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

এছাড়া আরো দুই ধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণিগোষ্ঠী আছে যারা জলের মধ্যে বসবাস করে। তাদের একটি গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে সাগরকুসুম, জেলি ফিস, প্রবাল প্রভৃতি বিচিত্র প্রাণী। এদের দেহে একটমাত্র নালী আছে, ওটাই ওদের মুখ এবং পায়ু। অন্যপ্রান্তে কোন ছিদ্র নেই, মুখকে ঘিরে অনেকগুলি কর্ষিকা থাকে। এই ধরনের প্রাণিগোষ্ঠীকে একনালীদেহী বা সিলেনটারাটা বলে। অন্য গোষ্ঠীটি হলো স্পঞ্জজাতীয় প্রাণী। এরা জলে বাস করে এবং কোন কিছুর সঙ্গে নিজেদের আটকে রাখে এবং উদ্ভিদের মতো এদের দেহ অসংখ্য ছিদ্রময়। তাই এদের ছিদ্রক প্রাণী বা পরিফোরা বলে। এই প্রবাল ও স্পঞ্জ অবশ্যই সংগ্রহ করবে।

প্রাণিজগতের মধ্যে সরলতম প্রাণী হলো এককোষী অ্যামিবা, মনোসিস্টিস্, প্যারামেসিয়াম, ইউগ্লিনা প্রভৃতি প্রাণী। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয় এদের দেখতে।

এই এককোষী প্রাণিকুলকে আদ্যপ্রাণী বা প্রোটোজোয়া বলে। এদের অনেকে আমাদের দেহের মধ্যে বাস করে এবং আমাশয়, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে। প্রাণীদের মধ্যে মনে করা হয় এই ধরনের এককোষী প্রোটোজোয়ারাই প্রথম এসেছিল, এরা আদিমরূপের প্রতিভূ। ইউগ্লিনার কোষের মধ্যে আবার সবুজ ক্লোরোপ্লাস্ট আছে, যার জন্যে উদ্ভিদবিদরা একে উদ্ভিদ বলে দাবি করেন। ইউগ্লিনা প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝামাঝি একটি রূপের প্রতিভূ। তোমাদের ল্যাবরেটরীর জন্যে যদি একটি মাইক্রোসকোপ কিনতে পার, তা হলে খালি চোখে দেখা যায় না এমন এক বিচিত্র সুন্দর জীবজগতের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ধরা দেবে।

বিজ্ঞান কলেজ, 35 বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলি-19

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র / লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

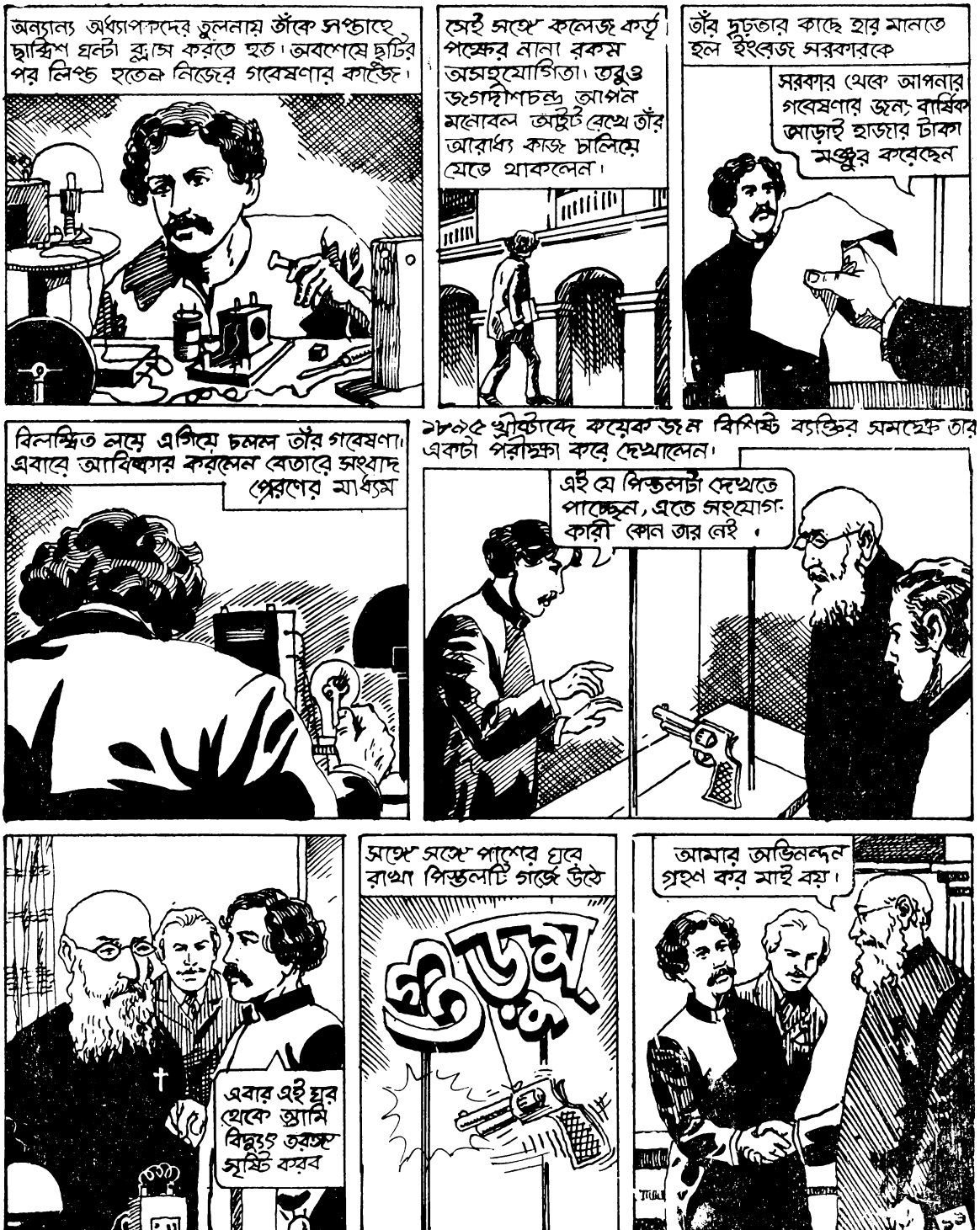

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

সম্রাট পেঙ্গুইন

আমাদের এ পৃথিবী বড়ই বিস্ময়ের !

এখানের আজব আর আশ্চর্যজনক ব্যাপারটা হলো, একবার কিছু বিজ্ঞানী মিলে অনেক ফন্দি এঁটে, দক্ষিণ গোলার্ধের পাশ থেকে এক জোড়া বুনো পেঙ্গুইন পাখী ধরেছিলেন। পাখী দুটো ছিল খুব বড়। লম্বা চওড়া এইসব পেঙ্গুইন পাখীকে সম্রাট বলা হয়। ঘটনাপ্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলে রাখি, সম্রাট পেঙ্গুইনরা সাধারণত উচ্চতায় 31/32 ফুট আর ভারী হয় 80 পাউণ্ডের মতো। এতই ভারী যে ভালো মত উড়তে পারে না, তবে এরা খুব ভালো সাঁতারু ও ডুবুরী। পানকৌড়ির মত ঝাঁ করে ঘুরিৎ ডুব দেয়। এবং তাদের ডানা দুটো অদ্ভুতভাবে দাঁড়ের কাজ করে। ওদের ওই বরফের দেশেই দেখা যায়। যাই হোক, পেঙ্গুইন দম্পতিকে ধরার পর সেই বিজ্ঞানীর দল ক্যালিফোরনিয়ার সানডিয়েগো অঞ্চলে, হাবস্ সী ওয়ার্ল্ড রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তার বেশ কিছুদিন পর তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, সেই বিশাল পক্ষী সম্রাট তার সম্রাজ্ঞীর পাড়া ডিমটাকে কাছে টেনে নিয়ে অতি যত্নে তা দিচ্ছে। এদের প্রকৃতি বোধ হয় এই রকমের। স্ত্রী-রা ডিম পাড়ে, পুরুষরা তা দেয়। প্রায় 64 দিন অপেক্ষার পর দেখা গেল, ডিম ভেঙ্গে বাবার কোলের ভিতর থেকে মুক্ত দুনিয়ায় গলা বাড়িয়েছে শিশু পেঙ্গুইন। ডিম ভেঙে প্রথম গলাটিই বেরোয়।

সজীব আলো

জলের তলায়, বিশেষ করে সমুদ্রের তলদেশে নিশা অন্ধকার হওয়ারই তো কথা। কিন্তু সব জায়গায় তাই কি হয়? বরং অবাক হতে হয় সেইসব জলজ উদ্ভিদের কথা শুনলে যারা সেখানে আলোর মায়াজাল বোনে। সেই রকমই আশ্চর্যকর উদ্ভিদ্ এই কোরাল। দেখতে ঠিক ফুলের মতো। একসঙ্গে ঘেষাঘেষি ঝাড় হয়ে থাকে, কেউ কেউ একাও থাকে, আবার কোন কোনগুলি গোল বৃত্তের আকারে হয়।

আশ্চর্যকর ব্যাপারটি হলো এই সব উদ্ভিদের নিজস্ব রঙের উজ্জলতা আছে। এ উজ্জলতা এতই যে ঘুটঘুটে ভুতুড়ে পাতালপুরীও আলোয় ভরিয়ে তোলে জ্বলজ্বল করে। তাই ডুবুরীরা এইসব সজীব আলোগুলোকে জলন্ত লণ্ঠনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কোরাল জাতীয় উদ্ভিদের দেহ খুব নরম হয়। আকারে বড় কোরালরা জলের মধ্যে চরে বেড়াতে পারে না, এক জায়গায় নোঙর বাঁধে। আর তার সঙ্গে থাকে অনেক কঠিন বস্তু। শরীরের ঢাকনা হিসাবে কাজ করে। অনেকের মনেই হয়তো প্রশ্ন জাগবে, কোরালের গা থেকে যখন আলো নির্গত হয় তখন তাদের শরীর নিশ্চয়ই খুব গরম? এটা কিন্তু ভুল ধারণা। কোরালের শরীর খুবই ঠাণ্ডা হয়। এরা নীল, লাল, সবুজ, হলুদ প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। আলোর প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফলে স্বচ্ছ বস্তুতে যে উজ্জল রঙিন আভা দেখা যায় তাকে বলে প্রতিপ্রভা। এই প্রতিপ্রভা হয় একটা সূত্রে। সাধারণত সূর্যের কিরণ কোরালের গায়ে লেগে আবার ফিরে যায়। কোন তাপই সে গ্রহণ করে না, বা নিজে থেকে কোন উত্তাপ তৈরী করে না। সেজন্যে এগুলোকে ঠাণ্ডা আলোও বলা হয়। আবার কিছু কিছু কোরাল আছে যারা এমন জায়গায় বাস করে যেখানে খুব সামান্য সূর্যরশ্মি আসে। বিজ্ঞানীরা এখনো সঠিকভাবে বলতে পারেন নি কেন এই সব উদ্ভিদ্‌গুলোর দেহ থেকে আলো ঠিকরোয়। তাদের বিশ্বাস, এই আলোয় ছোট জলজ প্রাণীকে আকর্ষিত করে। আগেই বলেছি, এই বড় বড় উদ্ভিদ্ চার জায়গায় ঘুরতে পারে না। খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারে এদের সম্বন্ধে দারুন একটা জিনিস জানা গেছে। সেটা হলো, খাদ্য তাদের কাছে আসে। এখন প্রশ্ন কিভাবে আসে? কোরালের গায়ে থাকে এক ধরনের শোঁয়া। দিনের বেলায় শোঁয়াগুলি খোলের ভিতর লুকিয়ে থাকে, রাত্রিবেলা সেই শোঁয়াগুলি খাড়া হয়ে ওঠে, দূর থেকে কোরালকে খাদ্য ভেবে সাঁতরে আসে ক্ষুদে ক্ষুদে সামুদ্রিক প্রাণীর দল। বড় অদ্ভুত লাগে যে, শেষ পর্যন্ত এরাই কোরালদের খাদ্য হয়ে যায়।

37/1, কবিগুরু সরণি, বেহালা, কলি—700034

লোহা ভারি, না তুলো?

অরূপরতন ভট্টাচার্য

এক কুইনটল লোহা ভারি, না এক কুইনটল তুলো?

এটা কিরকম প্রশ্ন হলো? নিশ্চয়ই এই কথাটাই সকলের মনে হচ্ছে।

ওজনে দুই সমান পরিমাণের বলা হয়েছে। অথচ কোন্‌টা ভারি এমন কথা জিজ্ঞেস করার কি মানে হতে পারে?

কেউ হয়তো লোহা আর তুলোর নাম শুনেই বলবে, লোহাই ভারি, পরিমাণের দিকে তাকাবে না। এ সেই ধাঁধার মতো, বিমানে যাওয়ার সময় লাগছে 80 মিনিট, ফেরার সময়ে 1 ঘণ্টা 20 মিনিট—কোন্‌ পথে যেতে দেরি হয়?

বিমানের বেলায় সময় সমান লাগলে কি হবে, ওজনের বেলায় ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক ওরকম নয়। আমাদের চার পাশে আছে বাতাস। এই বাতাসে প্রতিটি বস্তুই কিছুটা ওজন হারায়।

হারানো ওজনের পরিমাণ কতটা?

ব্যাপারটার পরিষ্কার হিসেব আছে। প্রতিটি বস্তুর যা আয়তন, ঠিক সেই আয়তন বাতাসের যা ওজন হবে, বস্তুটি ওজন হারাবে সেই পরিমাণে।

অবশ্য ওজন যে কমে আমরা নিজেরাই তা বুঝতে পারি।

জলে ডুব দেওয়ার সময়ে কি হয়?

শরীর তখন আগের চেয়ে হালকা লাগে।

কেন?

মাটির উপরে বাতাসের মতো, ডুব দেওয়ার সময়ে জল। শরীরের আয়তনের সমান জল ওজনে যা হবে, শরীর ওজন হারায় ততটা। সেই হারানো ওজনের জন্যে শরীর হালকা মনে হয়।

কোনো বস্তুকে তরলে ডুবালে এই যে তার ভার কমে আসা, এটাই হলো আর্কিমিডিসের সূত্রের মূল কথা।

আর্কিমিডিস ছিলেন একজন বিখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী। ইনি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর মূল্যবান গবেষণা থাকলেও জ্যামিতি নিয়ে মৌলিক চর্চাতেই তিনি জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে দেন।

আর্কিমিডিসের সূত্র নামে যা প্রচলিত, তা এই উদ্‌স্থিতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। এই সূত্রের আবিষ্কার নিয়ে একটা গল্প প্রায় অনেকেরই জানা।

সাইরাকিউজের অধিপতি হীরনের মনে একবার সন্দেহ হয়—তাঁর স্বর্ণমুকুটটি আগাগোড়া সোনায় তৈরি, না তাতে রূপোর খাদ মেশানো রয়েছে? মুকুটটি ভেঙ্গে অবশ্যই তা যাচাই করা যেতে পারে। কিন্তু না ভেঙ্গে?

সথার্থ সোনার মুকুট কিনা জানবার জন্যে তিনি আর্কিমিডিসের পরামর্শ চাইলেন।

জল ভর্তি চৌবাচ্চায় দেহ ডুবিয়ে স্নান করতে গেলে চৌবাচ্চার বাইরে জল উপছে পড়ে—যতটা জল উপচচ্ছে তা দেহের সমান। দেহও হালকা মনে হয়।

স্নানের সময় ব্যাপারটা লক্ষ্য করেই নাকি আর্কিমিডিসের সোনার মুকুটের সমস্যা সমাধানের কথা মনে হয়েছিল।

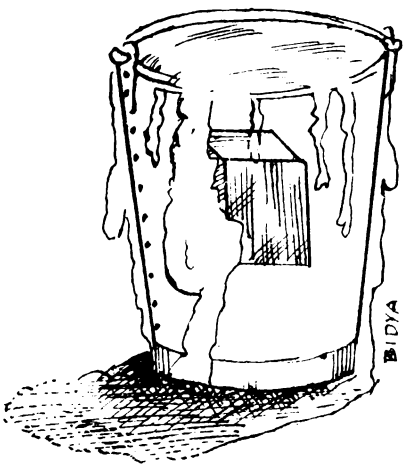

কাহিনী সত্য হোক বা না হোক, আর্কিমিডিসের সূত্রের আবিষ্কার হয়ে গেল।

তা হলে লোহা আর তুলোর বেলায় দুই-ই তাদের ওজন কিছুটা করে হারাবে। অর্থাৎ 1 কুইনটল লোহা বলতে যা বুঝেছি, তা 1 কুইনটল লোহা নয়। 1 কুইনটল তুলাও 1 কুইনটলের চেয়ে কম। এ ক্ষেত্রে সত্যিকারের ওজন পেতে গেলে হারানো ওজন যোগ করতে হবে।

1 কুইনটল লোহার বেলায় ঠিক ওজন পাব কি করে?

1 কুইনটল লোহার ঠিক ওজন 1 কুইনটল আর লোহা যতটা বাতাস সরাচ্ছে ততটা বাতাসের ওজন।

তুলোর বেলাতেও সেরকম। 1 কুইনটল তুলোর ওজন 1 কুইনটল আর তুলোর সরানো বাতাসের ওজন।

কিন্তু তুলো আর লোহার মধ্যে তুলনা করলে তুলো যে বাতাস সরায় বেশি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে বাতাস সরায় অনেক, অনেক গুণ বেশি।

তা হলে 1 কুইনটল তুলোর সত্যিকারের ওজন 1 কুইনটল লোহার চেয়ে বেশি হতে হবে এবং তা কয়েক কিলোগ্রামের কম নয়।

103/E, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-29

কার দৌড় কত ?

অলোককুমার সেন

অলিম্পিক কিংবা এশিয়ান গেমসের রেকর্ড বুকে নজর দিলে আমরা জানতে পারি পৃথিবীর দ্রুতগামী মানুষের নাম। দূর পাল্লার দৌড়ে যাঁরা অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদের যশ আজ আকাশছোঁয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাণিজগতের দিকে তাকালে আমরা এমন অনেক দৌড়বাজের সঙ্গে পরিচিত হব, যার ধারেকাছে আসা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আজ তোমাদের কাছে তেমন কয়েকটি জীব-জন্তু পাখি আর মাছের অবাক-করা দৌড়ের কথা শোনাব।

পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাণীর নাম চেরালেজ বাতাসী পাখী। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এরা ঘণ্টায় দুশো কুড়ি মাইল বেগে উড়তে পারে। তার মানে অত্যন্ত দ্রুতগামী বৈদ্যুতিক ট্রেনের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে। দৌড়ের প্রতিযোগিতায় বাতাসীর কাছাকাছি আসতে পারে বহেরি বাজ, শিকারের প্রতি ছোঁ মারার সময় তার গতিবেগ হয় ঘণ্টায় একশো আশি মাইল। পাখীদের অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক গলায় ঝোলাবে সোনালী ঈগল। ঘণ্টায় একশো কুড়ি মাইল বেগে উড়তে পারে সে। দৌড়বাজ পায়রা ঘণ্টায় প্রায় একশো মাইল উড়তে পারে। আবার রুদ্ধশ্বাস প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে তার ওড়ার গতি অনেক বেড়ে যায়। কাঁটা পেখমযুক্ত রাজহাঁস ছোটে ঘণ্টায় নব্বই মাইল।

এরা সবাই বিহঙ্গ অর্থাৎ ভেসে যায় বাতাসের সমুদ্রে। মাটির বুকে ছোটার লড়াইতে শিকারী চিতা প্রথম স্থান পাবে। তার গতি ঘণ্টায় সত্তর মাইল। মাছের জগতে সেল মাছ সাঁতরাতে পারে ঘণ্টায় আটষট্টি মাইল। বিশেষ প্রজাতির হরিণ শিংযুক্ত অ্যান্টিলোপ ঘণ্টায় ছোটে ষাট মাইল। তার সমান গতিসম্পন্ন অন্য দুই বন্ধুর নাম মঙ্গোলিয়ান স্যাজেল হরিণ আর ম্যালার্ড নামের বুনো হাঁস।

প্রশান্ত মহাসাগরের মারলিশস মাছ আর মাকো হাঙর সাঁতরে যায় প্রতি ঘণ্টায় আটান্ন মাইল।

এরপরের ধাপে বটের পাখী, সাধারণ বাতাসী পাখি, তলোয়ার মাছ। তারপর বন মোরগের স্থান। গতি তার ঘণ্টায় ছাপান্ন মাইল। তিতির ওড়ে তিপান্ন মাইল বেগে। ময়নার গতিবেগ পঞ্চাশ। লাল ক্যাঙারু পেটের থলিতে বাচ্চা নিয়ে ছুটতে পারে ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল। বিলোতি খরগোস এই লড়াইতে সঙ্গী হবে তার।

প্রাণমাতানো রেসের ঘোড়ারা দর্শকদের প্রবাল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মধ্যে ছুটে যায় ঘণ্টায় তেতাল্লিশ মাইল বেগে। সালুকি নামের অ্যালসেসিয়ান রেসের ঘোড়ার সঙ্গে সমান পাল্লায় দৌড়তে পারে। লাল খেঁকশিয়ালের গতিবেগ ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল। একই গতি আছে অস্ট্রেলিয়ার এমু পাখি আর পাতিকাকের।

এর খুব কাছাকাছি ছুটতে পারে ডালকুত্তা। উড়তে পারে সোয়ালো পাখী, সাঁতার দেয় ডলফিন। রাতের অন্ধকারে যে ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না ডেকে আনে নিঝুম নীরবতা, তার গতি ঘণ্টায় ছত্রিশ মাইল। উড়ুক্কু মাছেরা আকাশে ওড়ার সময় ঘণ্টা প্রতি পঁয়ত্রিশ মাইল বেগ বজায় রাখতে পারে, আফ্রিকার গণ্ডার আর নেকড়ে বাঘরাও একই গতিবেগ সম্পন্ন।

রাতের প্রজাপতি বাজমুখো মথ উড়ে যায় তেত্রিশ মাইল, বত্রিশ মাইল ছুটতে পারে লম্বা গলার জিরাফ, ওড়ার সময় গুয়ানো বাদুড়ের গতিবেগ হয় একত্রিশ মাইল। দুষ্প্রাপ্য সাদা কাক আর কোকিল মোটামুটিভাবে এক ঘণ্টায় সাতাশ মাইল বেগে উড়ে যায়।

দৌড়ের আসরে এরপর মানুষের স্থান। পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী মানুষের পক্ষেও ঘণ্টায় ছাব্বিশ মাইলের বেশি দৌড়নো সম্ভব নয়।

আমরা শুনে থাকি শামুক হলো সবচেয়ে অলস। সে নাকি মোটেই হাঁটাচলা করতে পারে না। কিন্তু মাত্র চার ইঞ্চি লম্বা শামুক এক ঘণ্টায় 0·03 মাইল হাঁটতে পারে। এবার কি আর তাকে কুঁড়ের বাদশা বলা যাবে ?

4/2 মধু গুপ্ত লেন, কল-700012

দশমিকের জন্ম

সাধনকুমার গিরি

আমরা এখন বাস করছি দশমিকের যুগে—ওজন, দৈর্ঘ্যের মাপ এবং মুদ্রার হিসাব করছি দশমিক প্রথায়। এই প্রথায় অঙ্ক কষে হিসাব করাও সোজা এবং এই কাজে যন্ত্রের ব্যবহার সহজ, সরল। এই দশমিক হিসাবের যুগে আসতে যে কতকাল লেগেছে তা নির্ণয় করা কঠিন। আদিম মানুষ প্রথমে গুনতে শিখেছিল হাত ও পায়ের আঙ্গুলের সাহায্যে। ন'টি অঙ্ক ও শূন্য এই নিয়ে সংখ্যা লিখতে শেখা তার অনেক অনেক পরে। মানুষ প্রথমে দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করবার জন্যে নিজেদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করত। যেমন হাতের কনুই থেকে মাঝের আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত, পায়ের পাতা, হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ডগা থেকে কড়ে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত (বিঘৎ)। হাতের চারটা আঙ্গুল পাশাপাশি রাখলে যে দূরত্ব—এই সব ধরা হত একক। কিন্তু এতে অসুবিধা অনেক। সব লোক সমান নয়—কেউ লম্বা কেউ বেঁটে, কেউ মোটা, কেউ রোগা। কাজেই তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপেও তফাৎ হয়। এই সমস্যা দূর করেন স্কটল্যাণ্ডের এক বিচক্ষণ রাজা ডেভিড। বড়, মাঝারি ও ছোট গড়নের তিনজন লোক বেছে নিয়ে তিনি তাদের একই হাতের বুড়ো-আঙ্গুল তিনটে পাশাপাশি রেখে এই দূরত্বকে তিন ভাগ করে এক ভাগকে দৈর্ঘ্যের একক ঠিক করে দিলেন। এই হলো স্কটল্যাণ্ডীয় ইঞ্চি।

ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় এডওয়ার্ড দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য পরিমাপনের কাজে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার তুলে দেন। তিনি তিনটি পরিপুষ্ট যবের দানা পর পর লম্বালম্বি সাজিয়ে সেই দৈর্ঘ্যকে একক ধরলেন—ইঞ্চি। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে এই হিসাব অধিকতর নির্ভরযোগ্য হলো। সর্বত্র একই এককে হিসাব যাতে হয়, তার জন্যেই তিনি এই ব্যবস্থা করেন। নইলে বেচাকেনার প্রতারণার সুযোগ থেকে যায়। মাপের হিসাবের তারতম্যে কেনবার সময় বেশি মাপের দণ্ড আর বেচবার সময় কম মাপের দণ্ড ব্যবহার করে দোকানদার দু তরফা মুনাফা করতে পারেন।

গোনা যায় না এমন সব জিনিসের পরিমাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাপের (আয়তনের) পাত্র ব্যবহৃত হত আগে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে শস্যাদির লেনদেন ব্যবহারে এখনও কুনকে. কোচা, পালি, চোঁটি, কনা পাই ইত্যাদি একক-পাত্রের চলন দেখা যায়। এরও আয়তনের তারতম্যে প্রতারণা করবার সুযোগ থাকে। তাই পরবর্তীকালে বাটখারা ব্যবহারের চলন হয়।

ইউরোপে প্রায় দুশো বছর আগে, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজারা প্রথম পরিকল্পনা নিয়েছিলেন—দুই দেশের মধ্যে পরিমাপনের একটা প্রথা চালু করবেন। কিন্তু দুই দেশের বৈঠক বসবার আগেই ফ্রান্স রাজাহীন হয়ে যায়। পরে 'পাউণ্ড' আর ফুটের ব্যাপক প্রচলন হলেও তারতম্য থেকে গিয়েছিল। এর কিছুকাল পরে এক ফরাসী কমিশন ঠিক করেন পৃথিবীর নিরক্ষরেখা থেকে মেরুবিন্দুর দূরত্বকে এক কোটি ভাগের এক ভাগকে দৈর্ঘ্য বা দূরত্বের পরিমাপনের এক মিটার ধরা হবে। সেখানকার গণিত-বিদরা বহু পরিশ্রম করে তার দৈর্ঘ্যও নির্ণয় করেন—0·39 ইঞ্চির কিছু বেশি। প্যারিসের নিকটবর্তী "ইনটার ন্যাশানাল ব্যুরো অফ্ ওয়েটস অ্যাণ্ড মেজার্স" প্রতিষ্ঠানে প্লাটিনাম ধাতুর মিটারদণ্ড এককের নমুনা হিসাবে রক্ষিত আছে। এই মিটারকে হাজার গুন করে হলো কিলো-মিটার, আর হাজার ভাগ করে হলো মিলিমিটার। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যখন ফ্রান্সের সম্রাট তখন সেখানে দশমিক প্রথার প্রবর্তন করেন। 1801 খ্রীষ্টাব্দে সরকারী আইনে এই প্রথাকে বিধিবদ্ধ করা হয়। এখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই মুদ্রার পরিমাপনেও দশমিক প্রথাকে অবলম্বন করেছে। ইংলণ্ডেও কিছুকাল হলো পাউণ্ড মুদ্রাকে দশমিকে পরিবর্তিত করা হয়েছে।

ওজনের জন্যে গ্রাম, কিলোগ্রাম এবং তরল পদার্থ মাপবার জন্যে লিটার, কিলোলিটারও এসেছে মিটারের থেকে। সে কথা কাউকে নিশ্চয়ই আর বলে দিতে হবে না।

সোমামুঠ, মেদিনীপুর

আগে যা ঘটেছে

রহস্যময়ভাবে মফস্বল শহরের একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল। যে ব্যাঙ্কে সদ্য ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে এসেছে সুশান্ত। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে, ব্যাঙ্কের তালা না ভেঙে স্ট্রংরুম থেকে ডাকাতি হয়ে গেল বহু টাকা। এটা কি করে সম্ভব? স্ট্রংরুমের তালা খুলতে হলে তো দুটো চাবির প্রয়োজন হয়—যার একটা থাকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে, আর একটা সুশান্তর নিজের কাছে। তা হ'লে ডাকাতেরা তালা খুলল কি করে? একটু পরেই এল পুলিশ। সকলের জবানবন্দী নেওয়া হল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একজন ডিরেক্টর এলেন। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীই দোষ চাপাল সুশান্তর উপরে। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, লকারের দুটো চাবির একটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সুশান্ত ভীষণ ভেঙে পড়ল। অবশেষে তার বাবার বন্ধু সতীনাথ বাবুকে কলকাতায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সতীনাথ বাবু—ডিটেক্‌টিভই শুধু নন, বড় বৈজ্ঞানিক। ব্যাঙ্ক সুশান্তকে সাসপেণ্ড করল। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে এলেন নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ কে. সি. ত্রিবেদী।

সতীনাথবাবু হঠাৎই এসে হাজির হয়েছেন সুশান্তকে কোন খবর না দিয়েই। তবে সুশান্তকে তিনি যে জিনিস দেখালেন, তাতে সুশান্তর চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। স্ট্রংরুমের আলমারীতে যে ছাপ পাওয়া গেছে, তা মানুষের হাতের ছাপ নয়—বানর জাতীয় কোন প্রাণীর!

সুশান্তকে নিয়ে সতীনাথ বাবু তার বন্ধু সরযূপ্রসাদের বাড়ি দেখতে এলেন। সেখান থেকে পুলিশের বড়কর্তার কাছে এসে তাঁকে ছোট্ট একটা জিনিসের ফিঙ্গার প্রিণ্ট করে দিতে বললেন। ফিঙ্গার প্রিণ্টটা কিছুটা নতুন খবর এনে দিয়েছে। এবার গোয়েন্দা সতীনাথ রায়কে বিজ্ঞানী সতীনাথ রায়ে নিয়ে যাবার পালা। কিন্তু তার আগে?

॥ চোদ্দ ॥

সেই রাত্রেই সতীনাথবাবু কলকাতায় ফিরবেন ভাবছিলেন। কিন্তু যাবার আগে মিঃ ত্রিবেদীর সঙ্গে আর একবার দু'টো কথা বলার ইচ্ছে ছিল তাঁর। ব্যাঙ্কে নয়, তাঁর বাড়িতে।

ঠিকানাটার হদিস তো পুলিশের বড় কর্তার কাছেই পেয়েছেন। কিন্তু—কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই তো ব্যাঙ্কে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তবে আবার বাড়ি গিয়ে উৎপাত করা কেন?

এর উত্তর সতীনাথবাবুই বলতে পারেন। তবে আমরা যতদূর জানি তিনি আর রিক্সা থেকে নামলেন না। রিক্সা-ওয়ালাকে বললেন চকবাজারের দিকে যেতে, দু'-চারটে খুঁটিনাটি জিনিস কিনতে হবে।

জিনিস এমন কিছুই না, দু'-চারটে স্থানীয় ফলফলারি। এখানকার পাকা পেঁপে খুব সুস্বাদু, দামেও সস্তা। কলকাতায় যা দাম তার চার ভাগের এক ভাগ। এখানকার আনারসও খুব নামকরা, ভারি মিষ্টি। আর একটা মস্ত গুণ খেলে মুখ চুলকোয় না। রিক্সা দাঁড় করিয়ে রেখেই বাজারে ঢুকে এটা সেটা দরদস্তুর করলেন তিনি, কিন্তু তখনই কিনলেন না। কলকাতায় রওনা হবার আগে কিনে নিলেই হবে। তবে সুশান্তকেও কয়েকটা দিয়ে যাবেন। আজকালকার ছেলেরা তো ও-সব দেশী ফলের মর্ম বোঝে না।

সুশান্তর কথা মনে পড়তেই মনে পড়ল ভাগ্যিস পুলিশের বড়কর্তার কবিতা পাঠ শুনেই সে চলে গিয়েছিল, ছোট-কর্তার কাছে আর যায় নি। নইলে ছোটকর্তার তার ওপর যেমন ধারণা দেখা গেল তাতে ওঁর সঙ্গে তাকে দেখলে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হতেন না। সুশান্ত সম্বন্ধে গোড়া থেকেই তিনি একটা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন—সেটা ঠিক নিরপেক্ষ নয়। সতীনাথবাবুর যে তার ওপর একটু দুর্বলতা আছে এ কথা তো তিনি মুখের ওপর বলেই ফেললেন। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল তাঁর, যেটা মুখের নতুন মেক্‌ আপে বাইরে ধরা পড়ল না।

চকবাজারের পিছন দিক দিয়ে যে রাস্তাটা সোজা নদীর দিকে চলে গেছে সেটারই প্রায় শেষদিকে মিঃ ত্রিবেদীর বাড়ি—বড় কর্তা এই রকম বলে দিয়েছিলেন। সতীনাথবাবু রিক্সাকে সেদিকেই চালাতে নির্দেশ দিলেন।

রাস্তা একটু একটু করে ফাঁকা ফাঁকা হয়ে আসছিল। দূরে নদীর আবছা তটরেখাও দেখা যাচ্ছিল, তার ওপারে ঘন মহুয়ার বন। এমন সুন্দর দৃশ্য কমই দেখা যায়। রিক্সওয়ালা জোরে প্যাডেল করে অল্প সময়ের মধ্যেই তার কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

ইতস্তত ছড়ানো কতকগুলি একতলা বাড়ি। বেশির

ভাগই নতুন তৈরী। একটু খোঁজ নিতেই ত্রিবেদী সাহেবের বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল। নদীর কাছাকাছি বলে বেশ জোরে হাওয়া বইছিল। সতীনাথ বাবু রিক্সা থেকে নেমে প্রথমেই অ্যাটাচি কেস থেকে একটা সিল্কের চাদর বার করে গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিলেন। রিক্সাওয়ালাকে বললেন, "বহুৎ জাড়া লাগতা" বুড্‌ঢা হো গয়া তো! তুম্ থোড়েসে ঠার যাও, ম্যাঁয় তুরন্ত আকর ফির ওয়াপস্ যায়েগা। বড্ড শীত লাগছে, বুড়ো হয়ে গেছি তো। তুমি এখানে একটু দাঁড়াও। আমি শিগগির এসে ফের ফিরে যাব)। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির বারন্দায় উঠে দরজায় আঁটা কলিং বেলটা টিপে দিলেন।

একটু পরেই ভিতর থেকে একটি অল্পবয়েসী মেয়ে বেরিয়ে এল। সোজাসুজি প্রশ্ন করল, "কিস্‌কো মাংতে? —কাকে চাই?"

"মিঃ ত্রিবেদী বাড়ি ফিরেছেন? তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করব।

মেয়েটি জানাল, 'এইমাত্র ফিরেছেন। ভেতরে কল ঘরে আছেন। আপনি একটু বসুন। আপনার নাম?'

সতীনাথবাবু অম্লানবদনে বললেন, "উনি চিনবেন না। বল মিঃ পাণ্ডে নামে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। পর মুহূর্তে তাঁর মনে হলো গলার স্বরটাও একটু ভারী করা দরকার। চকিতে একটা ট্যাবলেট পকেট থেকে বার করে মুখে পুরে দিলেন তিনি। দু'-তিনবার অল্প কাশির মত আওয়াজ হলো, তারপরেই ঠাণ্ডায় গলা ভেঙ্গে গেলে যেমন মোটা মোটা শব্দ শোনা যায় তেমনি শব্দ বেরুতে লাগল মুখ থেকে। পরীক্ষা করবার জন্যে সতীনাথবাবু গুন্ গুন্ করে যেন আপন মনেই সুর ভঁজতে লাগলেন— 'ভরদ্‌ওয়াজ মুনি বসছিঁ প্রয়াগা, জিনহিঁ রামপদ অতি অনুরাগা!'

মেয়েটি বসবার ঘরের দরজা খুলে তাঁকে বসতে বলে চলে গেল। মোটামুটি সোফাসেট্ চেয়ার দিয়ে সাজানো ঘরখানায় ঢুকেই সতীনাথবাবু আশ্চিবার করলেন, ঘরে তিনি একা ন'ন, দূরে জানলার ওপাশে আর একজন কেউ নিবিষ্ট মনে কি একটা ম্যাগাজিন পড়ছেন, কিংবা সম্ভবত, তার ছবি দেখেছেন। এ সব ক্ষেত্রে অপেক্ষা করবার সময় লোকে ম্যাগাজিন খুলে ছবিই দেখে, বড় একটা পড়ে না।

চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লোকটাকে চিনতেও তাঁর কষ্ট হলো না, যদিও এখানে এ সময়ে তাঁর উপস্থিতি খুবই অভাবনীয়।

কিন্তু সতীনাথবাবু বিজ্ঞানী হলেও পেশায় গোয়েন্দা, কাজেই কিছুতেই আশ্চর্য হন না তিনি। আর একবার কৌতুহলী দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে তিনি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

চেয়ার টানার শব্দে লোকটি তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন। কিন্তু তাঁকে যে চিনতে পারলেন না সে বিষয়ে সতীনাথ বাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন। আর অ্যাটাচি কেস্‌টা? ওরকম তো কত লোকেরই সঙ্গে থাকে আজকাল! ওতে কোন বিশেষত্ব নেই। বরঞ্চ ঐরকম একটা অ্যাটাচি কেস নিয়ে চলাফেরাই তো এখন একটা ফ্যাশন। রাম-শ্যাম, যদু-মধু সবাই ঐ নিয়ে ঘোরে।

একটু পরেই ত্রিবেদী ঘরে ঢুকলেন। সতীনাথবাবুর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন একবার। বলা বাহুল্য তিনিও চিনতে পারলেন না তাঁকে। প্রথমত থুৎনির নিচে ছোট্ট এক চিমটে ফরাসী ধাঁচের দাড়ি আর ঈষৎ পাকা ভুরুই এ ব্যাপারে যথেষ্ট ছিল, তার ওপর গায়ে জড়ানো সিল্কের চাদরটাও কিছু সাহায্য করল। আজকাল কেউ বিদেশে কিছুদিন কাটিয়ে দেশে ফিরে এলে বিদেশী পোষাক বড় একটা ত্যাগ করেন না। আগেকার দিনে অনেকে দেশে ফিরে দেশী পোষাক পরাটা কর্তব্য মনে করতেন। কিন্তু ওরই মধ্যে গায়ে একটা চাদর না জড়ালে তাদের মন খুঁত খুঁত করত। সে প্রথা এখন প্রায় উঠে গেলেও বৃদ্ধদের মধ্যে এখনও কেউ কেউ এটা বহাল রেখেছেন। কথাটা অনেকেই জানে, ত্রিবেদীরও হয়তো জানা ছিল।

ধুতি পরা থাকলেও সতীনাথবাবু কিন্তু তাঁর ভাঙ্গা গলায় চোস্ত ইংরেজিতেই কথা শুরু করলেন। বললেন, তিনি সম্প্রতি লণ্ডন হয়ে আসছেন। ব্যবসার খাতিরে ভারতের নানা জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হয়, এ অঞ্চলেও মাঝে মাঝে আসেন। যাই হোক, ঐ বিলেতেই তাঁর সঙ্গে এক ভদ্রলোকের আলাপ হয়েছিল। ঐ ভদ্রলোক তিনি এই শহরেও আসেন শুনে তাঁকে একটা প্যাকেট দিয়েছিলেন সরযূপ্রসাদকে দেবার জন্যে। সরযূপ্রসাদকে নাকি এখানে সকলেই এক ডাকে চেনে। আর এও বলে দিয়েছিলেন যদি সরযূপ্রসাদকে এখানে না পাওয়া যায়, তা হলে যেন তাঁর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর হাতে প্যাকেটটা দিয়ে দেওয়া হয়, যার তার হাতে নয়। দু'জন সেরকম বন্ধুর নামও তিনি বলে দিয়েছিলেন। একজন হচ্ছেন এখানকার ব্যাঙ্কের আগেকার ম্যানেজার সুশান্তবাবু, অন্যজন ঐ ব্যাঙ্কেরই বর্তমান ম্যানেজার মিঃ ত্রিবেদী। সুশান্তবাবু তো চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁকে কোথায় পাব কি পাব না ভেবে আপনাকে খুঁজে বার করাই সহজ মনে হলো। আপনার ব্যাঙ্কেই প্রথমে গিয়েছিলাম। সেখানে আপনার

দেখা না পেয়ে আপনার ঠিকানা জেনে এখানে আসছি, প্যাকেটটা আমার সঙ্গেই আছে, বলেন তো আপনার হাতে দিয়ে যাই। দিয়ে যাব?" বলেই সতীনাথবাবু পাকা ভ্রূ জোড়া ঈষৎ কুঁচকে একবার ত্রিবেদীর দিকে, একবার ঘরের অন্য ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে নিলেন।

যা আশা করেছিলেন তাই হলো। মিঃ ত্রিবেদী হঠাৎ কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন। অদূরে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটিও যেন কেমন একটু বিহ্বল চোখে চেয়ে রইলেন।

"বেশি সময় নষ্ট করব না আপনার।"—বলেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন সতীনাথ বাবু। কিন্তু কোথায় প্যাকেট? একবার এ পকেট, আর একবার ও পকেট হাতড়ালেন, কিন্তু কোনও প্যাকেট তো নেই সেখানে! মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ এনে বললেন, "কোথায় ফেললাম? মুশ্‌কিল বাধাল দেখছি! রিক্সায় ফেলে এলাম নাকি? নাকি হোটেলের টেবিলেই ফেলে এসেছি তাড়াতাড়িতে ভুলে? দেখি—" বলেই দ্রুতবেগে বেরিয়ে এলেন তিনি রিক্সর কাছে এবং একটু পরেই খালি হাতে ফিরে এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, "হোটেলেই টেবিলে ফেলে এসেছি মনে হচ্ছে! যাই, আবার দেখে আসি। আপনি কতক্ষণ আছেন বাড়িতে?"

ত্রিবেদী একবার আড়চোখে পাশের ভদ্রলোকটির দিকে তাকালেন এবং এবার উত্তর দিলেন সেই ভদ্রলোক। বললেন, আমরা তো এখনই বেরুচ্ছিলাম। আজ আর দেখা হবে বলে মনে হয় না। কাল না হয়—"

"কাল? কালকেই তো চলে যাব প্ল্যান্ করা আছে। আজ যদি একটু বেশি রাত করে আসি?"

"না না. আজ আর দেখা হবে না। আমাদের ফেরার কোন ঠিক নেই। আপনি বরঞ্চ ওটা ভালো করে সীল করে ওঁর ব্যাঙ্কেই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে যাবেন।" এবারও উত্তর দিলেন ঐ ভদ্রলোক।—"সরযূপ্রসাদ ফিরে এলে ঠিক পেয়ে যাবেন, আপনার ভাবনা নেই।"

ত্রিবেদী বোধ হয় কি করে গুছিয়ে জবাব দেবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

"ভালো কথা, আপনার নামটা?"—এতক্ষণে ত্রিবেদীর মুখ দিয়ে কথা বেরুল।

"পাণ্ডে। বি. সি. পাণ্ডে।"

এই সব কথাবার্তা কিন্তু সবই হলো ইংরেজিতে। আমরা এখানে শুধু বাংলায় তরজমা করে দিলাম। তবে ত্রিবেদীর সঙ্গে ভদ্রলোকের ইংরেজিটা মোটেই চোস্ত নয় আর নির্ভুল তো নয়ই। যাকে আমরা বলি হিন্দুস্থানী ইংরেজি, তাই।

সতীনাথবাবু এসে রিক্সায় চাপলেন। যাক, ওঁরা কেউই তাঁকে চিনতে পারেন নি। ত্রিবেদী তো নয়ই, ঐ ভদ্রলোকটিও নয়। অথচ একাধিকবার ওঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, কথাবার্তাও হয়েছে। মনে মনে হাসলেন তিনি। তারপরই গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে।

বেশ খানিকটা এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেশ একটু রাত করেই ফিরলেন তিনি। চাদরটা তখনও তাঁর গায়ে জড়ানো। থুৎনির নিচে তখনও সেই ছোট্ট এক চিমটে দাড়ি, ভ্রূ-যুগলে সাদার ছোপ লাগানো। বলা বাহুল্য সুশান্তর পক্ষেও তাঁকে চেনা সম্ভব ছিল না। ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা গেল তখনই, যখন দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি মৃদু করাঘাত করতে লাগলেন।

সুশান্ত ঘরের মধ্যেই ছিল, দরজার শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলেই নবাগত লোকটির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "কাকে চাই?" কারণ আজকাল তার বাড়িতে বাইরের লোক বড় একটা কেউ আসে না।

সতীনাথবাবু গলাটাকে যথাসম্ভব আরও গম্ভীর করে বললেন, "এখানে সুশান্তবাবু বলে কেউ থাকেন?"

"হ্যাঁ, আমারই নাম সুশান্ত। আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

"আসছি চকবাজার থেকে। থানার বড়কর্তা ধৈর্য ধরে তাঁর কবিতা শোনার জন্যে কিছু উপহার পাঠিয়েছেন।" বলেই দু'টো বড় বড় ঠোঙা খুলে তার একটা থেকে একটা মস্ত পাকা পেঁপে আর একটা থেকে একটা মস্ত আনারস বার করে হতভম্ব সুশান্তর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

সুশান্ত কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখে তিনি বললেন, "ধরুন এগুলো, কাউকে ভেতরে নিয়ে যেতে বলুন। আর হাতটা একটু ধোব, কল-ঘরটা কোন্ দিকে? ও, ঐ যে—ঐ তো—বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে সোজা গিয়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মনে হলো, তিনি শুধু হাতই ধুচ্ছেন না, গলাটাও সাফ করে নেবার জন্য বেশ ভালো করে 'গার্গল্' করে নিচ্ছেন।

সুশান্তর হতভম্ব ভাবটা তখনও কাটে নি। সতীনাথ বাবুর অ্যাটাচি কেস্‌টা তখনও সামনে পড়ে। মনে হচ্ছে ওটা যেন কেমন চেনা চেনা। কোথায় দেখেছে? কোথায় কোথায়? কিন্তু ভালো করে বুঝবার আগেই অট্টহাস্যে ঘর ভরিয়ে দিয়ে সতীনাথবাবু সশরীরে আবির্ভূত হলেন। গার্গল করার পর তাঁর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

তেমনি হাসতে হাসতে বললেন, "চিনতে পারলে না তো ? ছদ্মবেশ আর ছদ্ম কণ্ঠটা ভালোই হয়েছে বলতে হবে, তাই না ?"

কণ্ঠস্বর শুনে সুশান্ত অবাক হয়ে বললো, "কাকা ! আপনি ? কিন্তু এ চেহারা হলো কি করে ?"

সতীনাথবাবু মুহূর্তের মধ্যে থুতনির দাড়িটুকু একটানে খুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে ভ্রূ-দু'টো মুছে নিয়ে বললেন, "এই এমনি করে। চেহারা ঠিকই আছে, একবার পরখ করে দেখলাম তোমাকেও ঠকাতে পারি কিনা। দু'জনকে তো একটু আগেই ঠকিয়ে এলাম। দু'জনেই তোমার পরিচিত। এক তোমাদের ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ত্রিবেদী, আর দুই"—বলে সতীনাথবাবু চুপ করে গেলেন।

"দুই কে ?"—সুশান্ত সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল।

"উঁহুঃ, এখন বলব না, পাকা ঘুঁটি কেঁচে যেতে পারে। তবে জাল আস্তে আস্তে গুটিয়ে আনছি। আর কয়েকটা দিন সবুর কর, আশা করছি সব রহস্যেরই মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন শুধু সূত্রগুলি পর পর সাজিয়ে অঙ্ক কষার মতো কষে যেতে হবে। থিওরি অব্ প্রোবাবিলিটি জান তো ? এবার উত্তর মিললেই আমার কাজ হাসিল। কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

যা আশা করেছিলেন তাই হলো...

"কাল ভোরের ট্রেনেই একবার কলিকাতা যেতে হচ্ছে। কয়েকজন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করার আছে। ব্যস্, এখন আর অন্য কথা জিজ্ঞেস ক'র না।

(ক্রমশ)

16 টাউনসেণ্ড রোড, কলকাতা-25

ছবির মজা

প্রণব হোড়

দেওয়া হলো 'সিরিস'। সূর্য থেকে সিরিসের দূরত্ব পাওয়া গেল প্রায় 40 কোটি 30 লক্ষ কিলোমিটার, মানে বোডের সূত্র হিসেবে যেখানে অজানা গ্রহটি থাকবার কথা ঠিক সেখানেই। বিজ্ঞানীরাও প্রায় এটাই মেনে নিলেন। কিন্তু গোলমাল বাধলো গ্রহটির আয়তন নিয়ে। পর্যবেক্ষণের ফলে জানতে পারা গেল যে, সিরিসির ব্যাস মাত্র 1000 কিলোমিটারের কিছু বেশি। ওদিকে সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে ছোট গ্রহ বুধের ব্যাস হলো এর প্রায় পাঁচ গুণ বেশি। সুতরাং সৌরমণ্ডলের বাকি গ্রহগুলির পাশে এটিকে কিছুতেই গ্রহ বলে ভাবা যায় না। তা হলে এটা কি? জানবার জন্যে আরও অনুসন্ধান চলতে লাগলো।

1802 সালের মার্চ মাসে সূর্য থেকে প্রায় একই দূরত্বে আরও একটি ছোট গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেল। ব্যাস মাত্র 600 কিলোমিটার। নাম রাখা হলো 'পালাস'। এর পরের পাঁচ বছরে প্রায় একই কক্ষপথে খুঁজে পাওয়া গেল আরও দুটি ছোট গ্রহকে। নাম দেওয়া হলো 'জুনো' ও 'ভেস্তা'। জুনোর ব্যাস 190 কিলোমিটার, ভেস্তার প্রায় 550 কিলোমিটার।

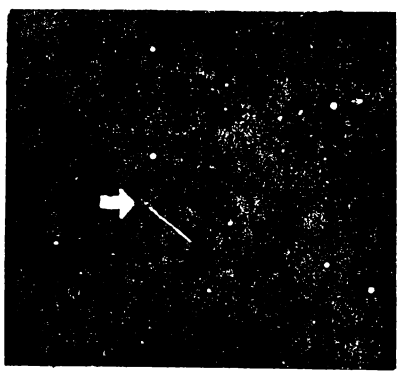

বিশেষ ধরনের ক্যামেরায় তোলা গ্রহাণুর ছবি। তীরচিহ্নে দেখানো লম্বা রেখাটাই হলো গ্রহাণু

একই কক্ষপথে একসঙ্গে এতগুলি 'গ্রহ' আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে সেগুলি গ্রহ নয়। আয়তনে খুবই ছোট হওয়ার দরুন এদের 'গ্রহাণু' বলাটাই ঠিক হবে। সমষ্টিগতভাবে এদের বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ।

পঞ্চম গ্রহাণু 'অ্যাস্ট্রিয়া'র সন্ধান পাওয়া গেল 1845 সালে। 1847 সালে আরও তিনটির সন্ধান পাওয়া গেল। এর পর প্রায় প্রতি বছরই কয়েকটা গ্রহাণু আবিষ্কৃত হতে লাগলো। এইভাবে 1890 সালের মধ্যে আবিষ্কৃত গ্রহাণুর সংখ্যা হয়ে দাঁড়ালো প্রায় তিনশো। কিন্তু এর পর চোখে দেখে গ্রহাণু আবিষ্কার করাটা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। কারণ বড় গ্রহাণুগুলি ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করা হয়ে গেছে। যারা বাকি রয়ে গেছে তারা সব কটিই খুব ছোট।

এই সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল 1891 সালে বিশেষ ধরনের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে। ঐ সব ক্যামেরায় তোলা ছবিতে গ্রহাণু লম্বা রেখার মতো দেখায়, ফলে তাদের চিনতে অসুবিধা হয় না। এইভাবে তোলা ছবিতে পরবর্তীকালে ঝাঁকে ঝাঁকে গ্রহাণুর সন্ধান পাওয়া যেতে লাগলো। ফলে আজ পর্যন্ত প্রায় দু'হাজার গ্রহাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কক্ষপথে প্রায় এক লক্ষেরও বেশি গ্রহাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যত বেশি গ্রহাণুর সন্ধান পাওয়া যেতে লাগলো, তাদের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা নাম দেওয়াটাও একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। গোড়ার দিকে দেওয়া হত পৌরাণিক দেবতাদের নাম, তারপরে আসতে লাগলো খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নাম, ফুলের নাম, বিখ্যাত শহরের নাম, মহিলাদের নাম, বন্দরের নাম, জাহাজ কোম্পানীর নাম, এমন কি মিষ্টান্নের নামে পর্যন্ত গ্রহাণুর নাম রাখা হয়েছে। পরে অবশ্য কেবলমাত্র সংখ্যা দিয়েই গ্রহাণুর নামকরণ করা শুরু হয়।

গ্রহাণুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চারটি হলো সিরিস, পালাস, ভেস্তা এবং হাইজিয়া। এদের ব্যাস যথাক্রমে 1003 কিলোমিটার, 608 কিলোমিটার, 538 কিলোমিটার এবং 450 কিলোমিটার। বাকি গ্রহাণুগুলির বেশির ভাগই খুবই ছোট, হয়তো বড় পাথরের টুকরোর মতো আকারের। একটা অনুমান হিসেবে সৌরমণ্ডলের সব কটি গ্রহাণুকে যদি একসঙ্গে জড়ো করা হয়; তবে তাদের মোট আয়তন আমাদের চাঁদের আয়তনের চেয়েও কম হবে। কিন্তু অত ছোট হলে কি হবে, প্রতিটি গ্রহাণু গ্রহের মতোই নিজের অক্ষে পাক খেতে খেতে নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

বেশি ভাগ গ্রহাণুর কক্ষপথ বৃত্তাকার। কিন্তু সূর্য থেকে সব দূরত্বে এদের সমাবেশ একরকম নয়, কোথাও কম, কোথাও বেশি। বলা যেতে পারে যে, গ্রহাণুগুলি কয়েকটি আলাদা আলাদা ঝাঁকে বিভিন্ন দূরত্বে সূর্যের চারপাশ ঘুরছে, অনেকটা যেন ইউরেনাসের বলয়ের মতো।

কিছু গ্রহাণুর চলন আবার অদ্ভুত। এদের কক্ষপথ এত বেশি উপবৃত্তাকার যে এরা কখনও শনিগ্রহের কাছাকাছি চলে যায়। আবার কখনও বুধগ্রহের কক্ষেরও ভিতর

চলে আসে। আবার একদল গ্রহাণু আছে যারা বৃহস্পতির আগুপিছু একই কক্ষে সূর্যের চারদিকে ঘোরে। এদের বলা হয় ট্রোজান।

অবশ্য এই আনাগোনার সময় কোন গ্রহাণুর পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা খুবই কম। বলা যেতে পারে কোটিতে এক। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে গ্রহাণুটি-এসেছে তার নাম হলো হারমিস্। 1938 সালের জানুয়ারী মাসে গ্রহাণুটিকে দেখা যায় পৃথিবী থেকে প্রায় 7 লক্ষ 76 হাজার কিলোমিটার দূরে।

গ্রহাণুপুঞ্জের উৎপত্তি কি করে হলো তা নিয়ে অনেক মত আছে। কিছু বিজ্ঞানীর ধারণা এগুলি কোন একটি আস্ত গ্রহের ভগ্নাবশেষ মাত্র। আবার অনেকে মনে করেন, এগুলি সৌরমণ্ডলের যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই এ-ভাবে আছে। হয়তো কোনও বিশেষ কারণে পুরো গ্রহের আকারে জোট বাঁধতে পারে নি।

ধূমকেতু

গ্রহ-উপগ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জ ছাড়াও সৌরমণ্ডলে আর যা আছে তা হলো ধূমকেতু ও উল্কা। এদের মধ্যে আকারে এবং আচরণে সবচেয়ে অদ্ভুত হলো ধুমকেতু। আকাশে এদের বিরাট ল্যাজওয়ালা তারার মতো দেখায়। কিন্তু এদের আবির্ভাব খুবই অনিয়মিত।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ ধুমকেতু দেখে আসছে। আগেকার কালে আকাশে ধূমকেতু দেখা গেলে মনে করা হত যুদ্ধ বা মড়ক হতে চলেছে। কিন্তু আজ আমরা জানি যে, এরকম ধারণার কোনও যুক্তি নেই। ধূমকেতুর আবির্ভাব কেবলমাত্র একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, এর সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের ভবিষ্যতের কোনও যোগাযোগ নেই।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, ধূমকেতু আসলে হলো বরফ জাতীয় বস্তুর ছোট ছোট কতকগুলো টুকরো যা বিভিন্ন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। অবশ্য সাধারণ গ্রহের সঙ্গে এর চলার পথের অনেক তফাৎ আছে। যেমন ধরো যে, কোন গ্রহের তুলনায় ধূমকেতুর কক্ষপথ অনেক বেশি রকমের লম্বাটে উপাবৃত্তাকার। তার কক্ষতলও অনেক বেশি হেলানো। আবার এমন ধূমকেতুও আছে যাদের চলাটা উলটো দিক দিয়ে। মানে গ্রহগুলো যেদিকে চলে তার উল্টো দিকে।

আগে মনে করা হত যে, বেশির ভাগ ধূমকেতুই সৌরমণ্ডলের বাইরে থেকে আসে। কিন্তু আসলে তা নয়। ওরকম মনে হওয়ার কারণ হলো ধূমকেতুর কক্ষপথের আকার। ধূমকেতুর কক্ষপথ প্রধানত দু'রকমের হয়। একরকম হচ্ছে অধিবৃত্তাকার। এরকম কক্ষপথে যেসব ধূমকেতু ঘোরে তাদের সাধারণত একবারই দেখতে পাওয়া যায়। আরেক রকমের কক্ষ হলো উপবৃত্তাকার। এরকম কক্ষে যে সমস্ত ধূমকেতু আছে তাদের নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে ফিরে আসতে দেখা যায়। বিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতু হলো এ ধরনের একটি নিয়মিত ধূমকেতু। এটিকে গতবার দেখা গিয়েছিল 1910 সালে, আবার দেখা যাবে 1986 সালে।

হ্যালির ধূমকেতু। এটিকে আবার 1985-86 সালে দেখা যাবে

আকাশে ধূমকেতুর প্রধান লক্ষণ হলো এর উজ্জ্বল ল্যাজ। ঐ ল্যাজ কিন্তু সব সময় থাকে না। যখন কক্ষপথে চলতে চলতে ধূমকেতু সূর্যের কাছাকাছি চলে আসে তখনই সূর্যের তাপে ধূমকেতুর দেহ থেকে গ্যাস ও ধূলোর কণা বেরিয়ে এসেই ঐ ল্যাজের সৃষ্টি হয়। আবার সূর্য থেকে ধূমকেতু যত দূরে চলে যায় তার ল্যাজও ছোট হতে থাকে আর এক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়।

এখানে একটা মজার কথা তোমাদের বলে রাখি।

ধূমকেতুর গতি যে মুখোই হোক না কেন তার ল্যাজ কিন্তু সব সময়েই সূর্যের উল্টো দিকে থাকে। মানে ধূমকেতু যখন সূর্যের দিকে আসছে তখন তার ল্যাজ থাকে পিছনের দিকে। আবার ধূমকেতু ঘুরে যখন সূর্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তখন ল্যাজটি থাকে সামনের দিকে।

উল্কা

রাতের আকাশে 'তারা খসা' কি তা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। কখনও কখনও মনে হয় হঠাৎ যেন একটা তারা ছুটে চলে গেল। আসলে কিন্তু ওগুলো তারা নয়। ওগুলো হলো খুব ছোটো ছোট বস্তুকণা যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে জ্বলে ওঠে। ওদেরই বলা হয় উল্কা। বেশির ভাগ উল্কাই বায়ুমণ্ডলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কখনও কখনও বড় আকারের উল্কাপিণ্ড মাটিতে এসে পড়ে।

ধূমকেতুর সঙ্গে উল্কার বিশেষ সম্পর্ক আছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা ধূমকেতুর ল্যাজ থেকেই উল্কার সৃষ্টি হয়। কারও মতে পৃথিবী যখন পুরানো কোনও ধূমকেতুর কক্ষপথের ভেতর দিয়ে চলে যায় তখনই বেশির ভাগ উল্কা দেখতে পাওয়া যায়।

কখনও কখনও উল্কাপিণ্ড এত বড় হয় যে, তা মাটিতে পড়ে প্রকাণ্ড গর্ত করে দেয়। পৃথিবীর ওপর উলকাপিণ্ড পড়ে সবচেয়ে বড় গর্ত তৈরী হয়েছে আমেরিকার আরিজোনায়। এর ব্যাস 1180 মিটার, গভীরতা 175 মিটার। অবশ্য এত বড় উল্কাপিণ্ড পড়ার ঘটনা খুবই বিরল। বেশির ভাগ সময়েই ছোটখাটো পাথরের টুকরোর মতো উল্কাপিণ্ড পড়তে দেখা যায়।

মাটিতে যে সব উল্কাপিণ্ড এসে পড়ে সেগুলি কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। কারণ ঐসব উল্কাপিণ্ডের অধ্যয়ন করে তাঁরা সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি এবং তার অতীতের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়েছেন। এমন কি, কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন যে ঐ উল্কাপিণ্ডই হয়তো আমাদের পৃথিবীকে জীবের উৎপত্তির রহস্যের সমাধান দিতে পারবে। কারণ বহু উল্কাপিণ্ডের বিশ্লেষণ করে তাতে এমন সব জৈব রাসায়নিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে জীবের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

7 ইউ. এফ. কলেজ রোড, নয়াদিল্লী-1

নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য
ভৌতবিজ্ঞান (Physical Science)-এর সেরা বই
ডঃ অলক চক্রবর্তী, ডি. এস. সি.
ও
অমিয়তোষ রায় লিখিত
বিজ্ঞান প্রবেশিকা
তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ
[সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও ব্যবহারিক অংশ সহ]
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯
ফোন ঃ ৩৪-৩১৫৭ * গ্রাম ঃ গ্রন্থাগার

রেফ্রিজারেটর

অরুণকুমার মৈত্র

'রেফ্রিজারেটর বা 'ফ্রীজ' বলতে সাধারণত যে যন্ত্রটাকে আমরা বুঝি, তার আবিষ্কার খুব বেশিদিনের নয়। প্রথম দিকে 'ফ্রীজ' ছিল বড়লোকদের বিলাসসামগ্রী। কিন্তু এখন মধ্যবিত্তদের মধ্যেও এর বহুল প্রচলন। বিশেষ করে ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে 'ফ্রীজ'কে কোনমতেই বিলাসদ্রব্য আখ্যা দেওয়া যায় না। বরং প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রীর মধ্যেই একে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

'রেফ্রিজারেটর' বলতে আমরা সাধারণত বুঝি সাদা বা হাল্কা ক্রীম রঙের বাক্সের মতো যন্ত্র, যার মধ্যে জল ঠাণ্ডা করা যায়, আইসক্রীম তৈরী করা যায়, মাছ-মাংস-ডিম তরিতরকারী সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু 'রেফ্রিজারেটর' কথাটার আসল অর্থ অনেক ব্যাপক।

'রেফ্রিজারেশন' কথাটার প্রকৃত অর্থ হলো—কোন আবদ্ধ জায়গায়, স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে কম তাপমাত্রা সৃষ্টি করা এবং সেই সৃষ্ট তাপমাত্রাকে রক্ষা করা। সৃষ্ট তাপমাত্রাকে রক্ষা করতে হলে, বাইরে থেকে আবদ্ধ জায়গায় সবসময় যে তাপ প্রবেশ করে, তাকে পাম্প করে বের করে দিতে হয়। সুতরাং 'রেফ্রিজারেটর'কে একধরনের তাপ-পাম্পও বলা যেতে পারে।

আধুনিক রেফ্রিজারেটর সম্পর্কে কিছু বলবার আগে বরফের সাহায্যে শীতলীকরণ সম্পর্কে কিছু বলা অবশ্যই কর্তব্য। বরফের সাহায্যে শীতলীকরণ হলো সব থেকে প্রাচীন পদ্ধতির 'রেফ্রিজারেশন'। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিশেষ করে মাছ সংরক্ষণ করতে এর ব্যবহার এখনও আছে।

আমরা জানি, সাধারণ চাপে, বরফের গলনাংক 0°C। আর একথাও জানি যে, 0°C তাপমাত্রায় প্রতি গ্রাম বরফ, 0°C তাপমাত্রায় জলে পরিণত হতে গেলে 80 ক্যালোরি তাপের প্রয়োজন হয়। এই তাপকে বলা হয় লীন তাপ। এই লীন তাপ কেবলমাত্র অবস্থারই পরিবর্তন ঘটায় (বরফ থেকে জল অর্থাৎ একই রাসায়নিক বস্তুকে কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিবর্তন)। কিন্তু কোন তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটায় না। গলনের জন্যে প্রয়োজনীয় লীন তাপ, বরফ সংগ্রহ করে তার পারিপার্শ্বিক থেকে। কিন্তু বরফকে তাপ দান করবার ফলে পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রা কমে যায়।

নিচের ছবি থেকে কিছুটা ধারণা করা হয়তো সম্ভব হবে।

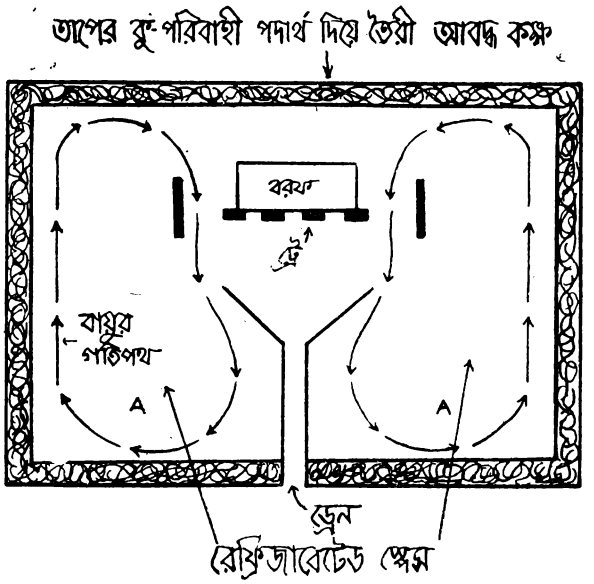

'A' অংশকে বলা হয় শীতলীকৃত জায়গা বা 'রেফ্রিজারেটেড স্পেস'। অর্থাৎ রেফ্রিজারেটরের কাজ হলো, 'A' জায়গাকে ঠাণ্ডা করা এবং ঠাণ্ডা রাখা।

যে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনকে অবলম্বন করে শীতলীকরণ করা হয়, সেই কার্যকরী পদার্থকে বলা হয় 'রেফ্রিজারেণ্ট'। এক্ষেত্রে বরফ হলো রেফ্রিজারেণ্ট।

এই পদ্ধতিতে রেফ্রিজারেশন হয় বায়ুর পরিচলন স্রোত বা 'কনভেকটিভ কারেণ্টে'র সাহায্যে। বরফের সংস্পর্শে এসে বায়ু ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা বায়ু ভারী বলে নিচের দিকে নেমে যায়। তার জায়গা দখল করে গরম বায়ু। এই গরম বায়ু আবার ঠাণ্ডা হয়ে নিচে নামে। এইভাবে পরিচলন স্রোতের সাহায্যে 'A' অংশ ঠাণ্ডা হতে থাকে। এই পদ্ধতিতে সমস্ত বরফ গলে জল হয়ে গেলে আবার বরফ দিতে হয়। তাই এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'ওপেন সিস্টেম'। যে প্রক্রিয়ায় একই রেফ্রিজারেণ্টকে বার বার ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় 'কোল্‌জড্ সিস্টেম'। আধুনিক রেফ্রিজারেটর দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই চলে। আমাদের ঘরে, মিষ্টির দোকানে কিংবা ওষুধের দোকানে যে রেফ্রিজারেটর আছে, তাতে 'ফ্রিয়ন-12'কে রেফ্রিজারেণ্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর রাসায়নিক

নাম, 'ডাইক্লোরো-ডাইফ্লুয়োরো মিথেন' এবং রাসায়নিক সংকেত 'CCl_2F_2'। 'রেফ্রিজারেন্ট-12' বা 'R-12' নামেও এর পরিচিতি আছে।

আধুনিক রেফ্রিজারেটরে শীতলীকরণের একটা আবর্তন চক্র সম্পূর্ণ করতে চারটে 'অপারেশন' বা কার্যক্রমের দরকার হয়। কার্যক্রমগুলি হলো যথাক্রমে ঃ

ক) কম্প্রেশন বা সংকোচন
খ) কনডেনসেশন বা ঘনীভবন
গ) এক্সপ্যানশন বা প্রসারণ
ঘ) ভেপারাইজেশন বা বাষ্পীভবন

নিচের ছবি দেখলে ব্যাপারটা সহজবোধ্য হবে।

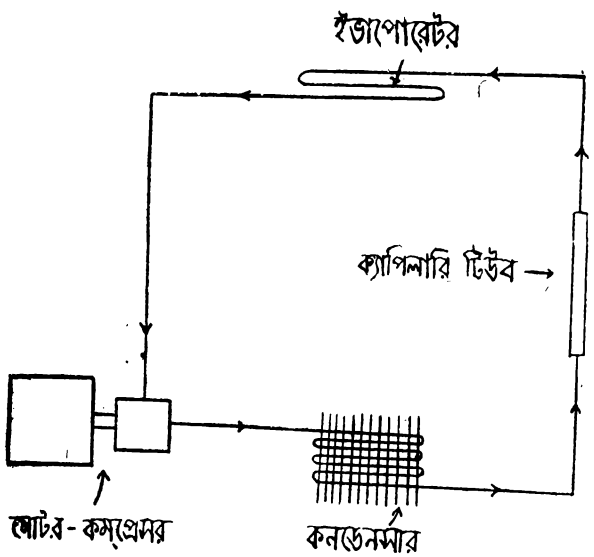

'ফ্রিয়ন' গ্যাসকে কম্প্রেসরে উচ্চচাপে সংকুচিত করা হয়। এর ফলে 'ফ্রিয়ন' গ্যাসের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়। উচ্চচাপের 'ফ্রিয়ন' গ্যাসকে তারপর কণ্ডেনসারে ঠাণ্ডা করা হয়। ঠাণ্ডা করবার ফলে 'ফ্রিয়ন' বায়বীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উচ্চচাপের তরল 'ফ্রিয়ন'কে তারপর ক্যাপিলারী টিউবের মধ্য দিয়ে বের করে প্রসারিত করা হয়। তারপর, ইভাপোরেটরে তরল (সঙ্গে বাষ্পও কিছুটা মিশ্রিত থাকে) 'ফ্রিয়ন' বাষ্পীভূত হয়। বাষ্পীভবনের জন্যে প্রয়োজনীয় লীন তাপ সংগৃহীত হয় 'রেফ্রিজারেটেড স্পেস' থেকে। তারপর বাষ্পীভূত 'ফ্রিয়ন' আবার চলে যায় কম্প্রেসরে। এইভাবে পূর্ণ হয় একটা আবর্তনচক্র। চক্রের পর চক্র চলতে থাকে।

এই পদ্ধতির রেফ্রিজারেশনে সমস্ত লাইনটাই নিশ্ছিদ্র রাখা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে, একদিকে যেমন রেফ্রিজারেন্ট বাইরে বেরিয়ে যাবে, অন্যদিকে তেমনই বায়ুর সঙ্গে জলীয় বাষ্প ভিতরে প্রবেশ করে জমে বরফ হয়ে বিশেষ করে ক্যাপিলারী টিউবকে বন্ধ করে দেবে। 'ফ্রীজ'-এর পিছন দিকে কালো রঙের যে সরু প্যাঁচালো টিউব দেখা যায়, তা হলো 'কনডেনসার'। এটা বায়ুতে ঠাণ্ডা হয়। তবে বড় বড় জায়গায়, যেমন বরফ উৎপাদন কেন্দ্রের বা হিমঘরের কনডেনসার, জল দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়।

ঘোষণা

বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক, 'সায়েন্স রিপোর্টার' পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীবিমান বসুর ধারাবাহিক রচনা 'গ্রহ পরিচয়' এই সংখ্যাতেই শেষ হল। নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা থেকেই তিনি শুরু করবেন আকর্ষণীয় ধারাবাহিক রচনা

অচেনা আকাশ

বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে

সুনির্মল রায়

জীবনে চলার পথে মাঝেমধ্যে কিছু কিছু প্রশ্ন, কিছু জিজ্ঞাসা নিয়ে আমরা নাজেহাল হয়ে পড়ি। সত্যিই কি করা উচিত তা আমরা সেই বিশেষ মুহূর্তে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। অনেক সময় না জানার ফলে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বা ভুল কাজ করার ফলে আমাদের অজান্তেই অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। এই সব ব্যাপার তাই ভাল করে জানা দরকার এবং জীবনে এর প্রয়োগ হওয়া দরকার।

ঝড়, বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সময় বাড়ির বৈদ্যুতিক সুইচ খুলে রাখা উচিত কি উচিত নয়—এরকমের একটি সংশয়। বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলবেন, ঝড়বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সময় বাড়ির বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করে রাখাই ভালো। বিদ্যুৎচমক মানেই একটি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সুইচ খোলা রাখলে তারের মধ্যে প্রবাহিত বিদ্যুৎতরঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হঠাৎ বেশি কম করে দিতে পারে। অন্ততঃ পক্ষে তারের মধ্যে প্রবাহিত বিদ্যুৎতরঙ্গের পরিবর্তন আসাটাই স্বাভাবিক। তার ফলে বাল্‌ব কেটে যেতে পারে। কারণ প্রতিটি বাল্‌বেরই একটা নিজস্ব সহ্যক্ষমতা থাকে। সেই সহ্যক্ষমতার এদিক ওদিক হলে অর্থাৎ কম বেশি হলেই তার মৃত্যু হতে বাধ্য। হঠাৎ বজ্রপাত হলে এবং সেই সময়ে বাল্‌ব্ জ্বললে তারের মধ্যে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে। সহ্যক্ষমতার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলেই বাল্‌বের তার কেটে গিয়ে বাল্‌ব্ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মিটারও খারাপ হয়ে যেতে পারে এর ফলে। বৈদ্যুতিক পাখাও অন্য রকম আচরণ করতে পারে। বজ্রপাতের ফলে যদি তারের মধ্যে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ সেরকম বেড়ে যায়, তবে তার পুড়ে যেতে পারে বা হয়তো ফিউজ গলে যেতে পারে। বজ্রপাতের ফলে তারের মধ্যে খুব বেশি বিদ্যুৎ হঠাৎ বেড়ে গেলে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হতে পারে। হঠাৎ বেশি চাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে তার যে দেওয়ালে আটকানো থাকে সেই দেওয়ালে ফাটল দেখা যেতে পারে। সুতরাং ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাতের সময় প্রতিটি সুইচ্ বন্ধ করে রাখাই ভালো।

বজ্রপাতের সময়, ঝড়বৃষ্টির সময় রেডিও খুলে রাখা কি ঠিক? এ প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলবেন, না, ঠিক নয়, তখন রেডিও বন্ধ রাখাই ভাল। যুক্তি অনেকটা আগের মতোই। বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে রেডিওর বিভিন্ন তার পুড়ে যেতে পারে, রেডিওর ভিতরের অংশের ক্ষতি হতে পারে। সব চাইতে বড় কথা, অনেক দূর থেকে আসা শব্দতরঙ্গ ঝড়ের ফলে ব্যাহত হয় এবং ঘড়ঘড় আওয়াজ হয়, ভাল শোনা যায় না। আর একটা সংশয় অনেকের মধ্যে দেখা দেয়—রেডিও জোরে চালালে কি বেশি ব্যাটারি খরচ হয়? না, কম জোরে চালালে যা খরচ হয় বেশি জোরে চালালেও একইরকম ব্যাটারি খরচ হয়? এর কোন্‌টা ঠিক? বেশ কিছু বিজ্ঞানী বলবেন, বেশি জোরে রেডিও চালালে বেশি ব্যাটারি খরচ হওয়াই স্বাভাবিক। রেডিওর শব্দের কম বেশি হওয়ার জন্যে রেডিওর অ্যামপ্লিফায়ার সারকিট দায়ী। রেডিও ষ্টেশন থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের মাথায় চাপিয়ে শব্দ পাঠানো হয়। কেউ যখন রেডিও খুলে রাখে সেই নির্দিষ্ট তরঙ্গে, তখন তার রেডিওর এরিয়ালে সেই বেতার-তরঙ্গ ধরা পড়ে এবং রেডিওর ট্রান্‌সফরমারে উচ্চ কম্প্যাঙ্কের স্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং L-C নামে একটা বর্তনীর সাহায্যে ঐ স্পন্দন ট্রায়োডের গ্রিড-বর্তনীতে আরোপিত হয়। রেডিও থেকে যে তরঙ্গের মাথায় চাপিয়ে শব্দ পাঠানো হয়েছিল ট্রায়োডের সাহায্যে সেই তরঙ্গ থেকে পাঠানো শব্দ পৃথক হয়ে পড়ে। ট্রায়োড বিবর্ধকরূপে কাজ করে।

তাঁদের মতে তার বিবর্ধনক্ষমতা = $\frac{\text{প্লেট ভোল্টেজের পরিবর্তন}}{\text{গ্রীড্ ভোল্টেজের পরিবর্তন}}$

সুতরাং জোরে রেডিও চালাতে গেলে বিবর্ধনক্ষমতা

বেশি করতে হবে। বিবর্ধনক্ষমতা বাড়ালে প্লেট ভোল্টেজের পরিবর্তন বেশি হয়। প্লেট ভোল্টেজের পরিবর্তন বেশি হলে ব্যাটারি খরচ বেশি হবে। সুতরাং রেডিও জোরে চালালে ব্যাটারি খরচ বেশি হবে। কম জোরে চালালে ব্যাটারি খরচও কম হবে।

প্রচলিত আছে—সূর্যগ্রহণের সময় খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা উচিত নয়। কেউ কেউ বিপক্ষে বলবেন। কেউ বা বলবেন পক্ষে। পক্ষে যেসমস্ত বিজ্ঞানী বলবেন তাঁদের মতে খাদ্যবস্তু ঐ সময় দূষিত হতে পারে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সূর্যগ্রহণ মানে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর এসে পড়ছে। তাই আমরা পূর্ণ বা আংশিক সূর্য-গ্রহণ দেখি। এই সময়ে সূর্যের আলো পৃথিবীর ঐ অংশে এসে পৌঁছতে পারছে না। জীবাণু ধ্বংসকারী এই আলো পৃথিবীতে আসতে না পারার জন্যে খাদ্যবস্তুর কিছুটা দূষিত হতে পারে। তা ছাড়া এই সময় সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ একই সরলরেখায় অবস্থান করে এবং চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছে থাকে। সূর্যের প্রখর আলোতে চাঁদ থেকে কিছুটা বিষাক্ত বাষ্প বা ক্ষতিকারক বিকিরণও বেরিয়ে আসতে পারে, যেটা খাদ্যবস্তুকে দূষিত করতে পারে। সুতরাং সূর্যগ্রহণের সময় খাদ্যবস্তু গ্রহণ না করাই উচিত।

চন্দ্রগ্রহণের সময় আবার পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ছে। এক্ষেত্রে অবশ্য বিষাক্ত বাষ্প বা ক্ষতিকারক বিকিরণের সম্ভাবনা খুবই কম। সুতরাং এক্ষেত্রে খাদ্য-বস্তু দূষিত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে সূর্যগ্রহণের সময় খাদ্যবস্তু দূষিত হয়েছে এবং সেই খাবার খেয়ে কারো ক্ষতি হয়েছে একথা ঐ বিজ্ঞানীদের জানা নেই। তবে সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে চোখের ক্ষতি হয়েছে—এরকম কিছু খবর পাওয়া গিয়েছে।

পতনশীল বস্তু ওজনশূন্য

দেবাশিষ জানা

কোন বস্তুর ওজন লম্বভাবে নিচের দিকে ক্রিয়া করে। কোন তলের উপর অবস্থিত একটি বস্তুর তলের উপর প্রযুক্ত হয়। নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী, তলও বস্তুর উপর সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বল দিয়ে থাকে। তাই কোন বস্তু যে তলের উপর অবস্থান করে, সেই তল দ্বারা বস্তুর উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত প্রতিক্রিয়া বলের জন্যেই বস্তু তার ওজন অনুভব করে।

কোন ব্যক্তি লিফ্‌টে চড়ে সুষম ত্বরণে উপরে ওঠার সময় তাঁর বর্ধিত ওজন অনুভব করেন। লিফ্‌টে সুষম ত্বরণে ওঠার সময় লিফ্‌টের মেঝে যে প্রতিক্রিয়া বল দেয় তার মান বল $= m(g+f)$, যেখানে mg ব্যক্তির ওজন ও সুষম ত্বরণ f। তাই বর্ধিত ওজন অনুভূত হয়। পক্ষান্তরে, লিফ্‌ট সুষম ত্বরণ (f) সহ নিচে নামার সময় হ্রাসপ্রাপ্ত ওজন অনুভূত হয়। কারণ এক্ষেত্রে লিফটের মেঝে কর্তৃক প্রযুক্ত বল $= m(g-f)$

যখন লিফ্‌ট্‌ সুষম বেগসহ ওপরে ওঠে বা নিচে নামে, তখন লিফ্‌টের ত্বরণ শূন্য হওয়ায় ব্যক্তির ওজন হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে না। সাম্যাবস্থায় ভাসমান বস্তুর ক্ষেত্রে বস্তুর ওজন তরলের ঊর্ধ্বমুখী প্লবতাবলের সমান হয় এবং বস্তুর নিম্নমুখী ওজন ও তরলের ঊর্ধ্বমুখী প্লবতা বল একই উল্লম্ব সরলরেখায় ক্রিয়া করে বলে বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া বলের মান শূন্য। তাই ভাসমান বস্তুর ওজন শূন্য। সুতরাং প্রতিক্রিয়া বল (বস্তু কর্তৃক অনুভূত) ই বস্তুর ওজনের সৃষ্টি করে।

পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে বস্তুর উপর প্রযুক্ত প্রতিক্রিয়া বলের মান শূন্য। যেহেতু বস্তুটি পতনকালে কোন তলের উপর বল প্রযুক্ত করে না। সেইহেতু বস্তু কোন প্রতিক্রিয়া বল অনুভব করে না। যদি অবাধে পতনশীল বস্তুর সঙ্গে একটি স্প্রিং ব্যালেন্স যুক্ত করা হয়, তবে পতনকালে স্প্রিং ব্যালেন্সের পাঠ শূন্য হতে দেখা যায়।

কিন্তু, বাইরের যে কোন ব্যক্তির কাছে বস্তুর ওজন বর্তমান। তাই কোন তলের উপর দণ্ডায়মান ব্যক্তির হাতে পড়ন্ত বস্তু পড়লে ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বস্তুর ওজন অনুভব করে, বা সেক্ষেত্রে স্প্রিং ব্যালেন্স, বস্তুর সঠিক ওজনের (mg) পাঠ দেয়। যথার্থ বলতে, অবাধে পতনশীল বস্তু ওজন থাকে ঠিকই, তবে বস্তুর ওজনের অনুভূতি থাকে না। তাই মুক্তভাবে পতনশীল বস্তু ওজনশূন্যতা অনুভব করে।

একাদশ শ্রেণী, হিন্দ স্কুল, কলকাতা-73

পোলিও রোগের আবিষ্কার কাহিনী

নির্মলকান্তি ঘোষ

পোলিও রোগ এক মারাত্মক ব্যাধি। বিশেষ করে এ রোগ বাচ্চাদের হয়। হলে আস্তে আস্তে তারা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। পক্ষঘাতগ্রস্ত অঙ্গের পেশীগুলো অপুষ্টির জন্যে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। এর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে শিশুর জন্মের কয়েক মাস পর থেকে এক মাস অন্তর তিনবার টিকা নিতে হয়। তবে এ রোগ যে বড়দের হয় না তা নয়।

পোলিও রোগ আবিষ্কারের প্রথম যুগের কথায় আসা যাক্। এক তরুণ ডাক্তারের চিকিৎসা আর গবেষণা ছিল নেশা। বিশ্ববিদ্যালয়ে, গবেষণাগারে বিভিন্ন রোগের জীবাণু সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহের জন্যে তিনি প্রতিদিন নিয়মিত গবেষণা করতেন। আবিষ্কারের চেয়ে জানার ইচ্ছাই তাঁর প্রবল ছিল।

ডাক্তার খুব দয়ালু মানুষ। মানুষের সেবা করাই তাঁর একমাত্র ব্রত। আর সেজন্যেই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যায়ন করা। টাকাপয়সার প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিল না। তাঁর খ্যাতি অল্প দিনের মধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বহু দূর থেকে রোগী তাঁর কাছে ছুটে আসত। তখন তিনি হাসপাতালের এক ডাক্তার।

তারপর হঠাৎই একদিন ঘটনাটা ঘটলো।

হাসপাতালে একদিন এক মাহলা এলেন। তাঁর সঙ্গে একটি শিশু। ডাক্তার শিশুটিকে পরীক্ষা করলেন। শিশুটির পোলিও বা শিশু পক্ষাঘাত হয়েছে। রোগে ভুগে ভুগে শরীরটা বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হয়ে গেছে। বাঁচার আশা একবারে নেই বললেই চলে।

ডাক্তারকে ভীষণভাবে চিন্তিত দেখাতে লাগলো। তখন পর্যন্ত পোলিও রোগের কোন টিকা বা ওষুধ আবিষ্কার হয় নি। ভাবলেন, অকালে শিশুটি মারা যাবে। দুঃখে তাঁর বুকটা টন টন করে ওঠে। সেদিনই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন —এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে মায়েদের দুঃখ দূর করবেন।

ডাক্তার সেই সময় কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে গবেষণাগারে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। ঐ ঘটনার পর যে ডাক্তাররা পোলিও সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এর ফলে হাসপাতালে যাওয়ায় ভাঁটা পড়লো। আর চিকিৎসা ঠিকমত হতে লাগলো না। কিন্তু অন্যদিকে রাতদিন চলতে লাগলো পোলিও রোগ সম্বন্ধে গবেষণা।

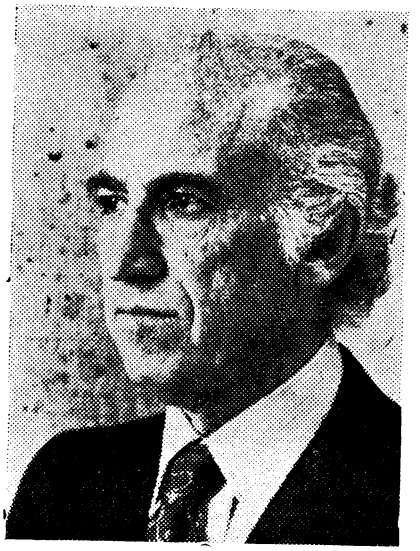

ডঃ জোনাস শালক্

ঐসময় পোলিও রোগে হাজার হাজার শিশু আক্রান্ত হতে লাগলো। কেউ প্রাণে বেঁচে যেত, কেউ বা দীর্ঘদিন রোগযন্ত্রণার পর মারা যেত। আর যারা বেঁচে যেত, তারা বিকলাঙ্গ হয়ে এক দুর্বিষহ জীবন যাপন করত। অনেক সময় তাদের বাবা-মারা মনে করত, এর চেয়ে মরে গেলেও ভালো হত। এ কষ্ট যেন চোখে দেখা যায় না!

ইতিমধ্যে পৃথিবীর অন্য দেশের গবেষকরা পোলিও রোগের বিষয়ে কিছু প্রতিষেধক এবং কিছু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তাতে তরুণ ডাক্তারের অনেক সুবিধে হলো। তিনি অন্য ডাক্তারের সঙ্গে কিছুদিন গবেষণা করার পর নিজেই স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে দিলেন।

ইতিমধ্যে কয়েক বছর কেটে গেল। একদিন ডাক্তারের কঠিন তপস্যা সার্থক হলো। বার করলেন তিনি পোলিও রোগের টিকা। কিন্তু তার পরও রয়ে গেল সমস্যা। টিকা তখনও পরীক্ষা করা হয় নি। এটা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কার উপর প্রয়োগ করা যায়? ভেবে কিছু ইস্থির করতে পারছেন না।

অবশেষে ডাক্তারের জীবনে এক চরম মুহূর্ত এলো। অন্য দিকে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে নিজেই টিকা নেবেন বলে স্থির করলেন। যদি কিছু খারাপ হয় তো তাঁরই

হবে। আর তাঁর দয়ার শরীর। অন্যকে তিনি দুঃখ-কষ্টের মাঝে টেনে আনতে চান না।

ডঃ অ্যালবার্ট সাবিন

এক শুভদিনে ডাক্তার নিজের শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন পোলিও রোগের ভাইরাস। প্রবেশ করাতে গিয়ে তাঁর হাতটা একটুও কাঁপলো না। কিংবা তাঁর মুখের রেখার কোন বিকৃতি ঘটলো না।

এখন শুধু দেখার পালা। ডাক্তার শরীরে কোন রকম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন কিনা, অথবা তাঁর শরীরে পোলিও রোগের লক্ষণ দেখা দেয় কিনা। না, তা দেখা দিল না। ফলে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। এখন টিকা অন্যকে দিতে আর কোন অসুবিধে নেই। এবং এই টিকায় পোলিও-রোগের প্রতিষেধকের কাজ করবে।

সেদিন ডাক্তার ইচ্ছে করলে আবিষ্কারটিকে পেটেণ্ট করে কোটি কোটি ডলার উপার্জন করতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেন নি। শুধু জগৎকে জানিয়ে দিলেন তাঁর আবিষ্কারের কথা। এরপরই যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগলো তাঁর নাম। দূর হলো পোলিও রোগের ভয়াবহতা।

এই তরুণ ডাক্তারটির নাম জোনাস শালক্। যে সব শিশু জন্মের কয়েক সপ্তাহ পর থেকে এক মাস অন্তর তিনবার টিকা নেয়, তাদের শিশু পক্ষাঘাত বা পোলিও-মাইলাসাটিস হয় না। অর্থাৎ শিশুর পোলিও রোগ হয় না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মানুষের দুঃখদুর্দশা লাঘব করার জন্যে সব সময় সচেষ্ট। জোনস শালকের পরে রুস সাবিন নামে একজন ডাক্তার পোলিও টিকার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাই পোলিও ব্যাপারে কোন কথা উঠলে চিকিৎসকরা শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানান শালক ও সাবিনকে।

128/2 হাজরা রোড, কলিকাতা-26

তোমরা কি জানো ?

তোমাদের জন্য তিনটে বাঘা বাঘা বই আমরা প্রকাশ করেছি। তার মধ্যে প্রথমটা হলো :

আবিষ্কারের পিছনে ১৬৲

ডাঃ মনীশ প্রধান

ভূমিকা লিখেছেন সমরজিৎ কর

তোমরা তো জানো, অসুখ করলে আমরা ওষুধ খাই, ইনজেকশন নিয়ে থাকি, কিন্তু কি ভাবে এতসব আবিষ্কার হলো তা হয়তো জানো না, ডাক্তারী শাস্ত্রের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আবিষ্কারের নানান কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক—যা কিন্তু গল্প নয় মোটেই, সত্যি। সোজা কথায় তোমাদের জন্য অসাধারণ একটি বই।

আমাদের দু নম্বর বইটি হলো

বিজ্ঞানের হরেকরকম ৭৲

অনীশ দেব

এতে আছে : মাপ কি করে এলো, পশুপক্ষীর শরীরে তাপ কিভাবে তৈরী হয়, বুদ্ধি কি করে মাপে, পৃথিবী কেমন দেখতে বা টিভিতে যা দেখা যায় না, এসব আশ্চর্য কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে সরস আলোচনা। এগুলো নিশ্চয় তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে। এসব বিষয় ছাড়াও প্রতি পাতায় মজার মজার ছবি উপহার দিয়েছেন লেখক নিজেই।

তিন নম্বর বইটিও কিন্তু প্রথম দুটোর চেয়ে কম নয়! এতে আছে ঘড়ি ও সময় মাপা নিয়ে নানান অজানা কথা

ঘড়ি নিয়ে রূপকথা ৭৲

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

আদিম মানুষ কি করে সময় মাপতে শিখলো, কি ভাবে আবিষ্কার হলো ছায়াঘড়ি, সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি। এছাড়া ইলেকট্রনিক ঘড়ি, পারমাণবিক ঘড়ি তো আছেই। সব মিলিয়ে এ এক মজার বই। সঙ্গে অনেক ছবি ও দুটো ফটোগ্রাফ।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

যে যে বইটা হাতে পেতে চাও পাঁচ টাকা অগ্রিম সহ নিচের ঠিকানায় পোস্টকার্ড পাঠাও। তাহলে ঘরে বসেই পেয়ে যাবে।

স্বপ্নদীপ ॥ ৭ই শীতলা লেন, কলকাতা-৫

হলুদ সন্ন্যাসিনী

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

শীতকালে এদের দেখা পাই নি। বসন্তের মিষ্টি হাওয়া বইতে শুরু করেছে। একদিন দেখি পুরানো গাছের গুঁড়ির ফাটল থেকে হলুদ একটি মুখ উঁকি দিল। ওখানে কে? কি করছে? কৌতুহল নিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখা গেল হলুদবসনা সন্ন্যাসিনী গুহার ভিতর থেকে বাইরে আসার চেষ্টা করেছে। গুহার মুখ কাঠের টুকরা দিয়ে বন্ধ করে সারা শীতকালটা সন্ন্যাসিনী ওখানে ধ্যান ধারণায় কাটিয়ে দিয়েছে। আবহাওয়ায় বসন্তের ছোঁয়াচ জানতে পেরে এখন বাইরে আসতে চাইছে।

কাঁচা হলুদের ছাল ফেলে লম্বা ফালি করে কাটলে যেমন দেখতে, তেমনি ছোট একটি টুকরা পিঠের ওপর জল্লাদের খাঁড়ার মত দুটি ডানা খাঁড়া হয়ে থাকে। উড়োজাহাজ বিমানবন্দরে নামার সময় চাকাওয়ালা পা বের করে নামিয়ে দেয়। তেমনি এর ছ'খানা হলুদ রঙের সুতোর মতো পা ওড়ার সময় বাইরের দিকে ঝুলে থাকে। গুহার ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে উড়ে উঠলো। গাছের গুড়ি বেষ্টন করে কয়েক পাক ঘুরলো। তারপর চলে গেল দৃষ্টির বাইরে। এটি বোলতা।

কয়েকদিন পরে সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে আবার দেখা। ঘাসের লনের ধারে রঙ্গনফুলের ঝাড় দিয়ে বেড়া দেওয়া। একদিন দেখি ঐ ঝাড়ের ভিতর থেকে সে বেরিয়ে এলো। ওখানে কি নতুন গুহার সন্ধান পেয়েছে? আস্ত গাছের ডাল সরিয়ে দেখা গেল, এবার গুহা নয়, সন্ন্যাসিনী এক মঠ তৈরী করতে শুরু করেছে। মাটি ইঁট কাঠ দিয়ে নয়, ওয়াটারপ্রুফ কাগজের বাড়ি। গাছের সঙ্গে আটকানো ছোট্ট মেটে রঙের ব্যাঙের ছাতার মতো দেখতে। ওটি নিরিবিলিতে নিজের বাসের মন্দির নয়, সন্তানপালনের নার্সিং হোম। গাছের শুকনো বাকল কেটে এনে চিবিয়ে নরম করে, তার সঙ্গে মুখের লালা মিশিয়ে কাগজের মণ্ড বানায়। সেই মণ্ড দিয়ে বানায় ছ-কোণা কুঠুরি, একটির সঙ্গে আরেকটি লাগানো, মৌচাকের কুঠুরির মতো। মৌমাছি চাক বানায় নিজের দেহ থেকে বের করা মোম দিয়ে, বোলতার চাক কাগজের মণ্ড দিয়ে বানানো। প্রাচীনকালে মিশরের লোকেরা 'প্যাপরাস' নামে জলজ নল থেকে কাগজ বানাতো, চীনারা বানাতো ছেঁড়া কাপড় ও তুলার আঁশ দিয়ে। বোলতারা এদের বহু আগেই কাগজ বানানোর কৌশল আবিষ্কার করেছিল।

মানুষের কাগজ থেকে এ কাগজ বেশি টেকসই ও জলনিরোধক। বোলতার চাকের ছাতার মতো ওপরের পিঠটা এমন মজবুত ও ওয়াটারপ্রুফ যে জল পড়লে তা অনায়াসেই গড়িয়ে যায়, বাসা ভিজে ছপ্‌ছপে হয়ে যায় না।

উপনিবেশ স্থাপন

টাকার আকৃতিমঠটিতে দু তিনটি কুঠুরি করেই সন্ন্যাসিনী তার মধ্যে ডিম পেড়ে সারাদিন ধরে বাড়ি তৈরীর কাজ করতেই থাকলো। দুইদিন পরে দেখা গেল, ডিম ফুটে ছোট সাদা রঙের বাচ্চা বের হয়েছে। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে মাথা ঘোরায়, হাত পা, ডানা কিছুই নেই, কেবল একটুখানি মুখের চিহ্ন। সন্ন্যাসিনীর কাজ এবার বেড়ে গেল, কুঠুরী বাড়াতে হবে। আবার বাচ্চাদের খাবার দিতে হবে। সন্ন্যাসিনীর এবার অসুরনাশিনী মূর্তি। একদিন এক ফড়িং ধরে এনেছে, তার ডানা কেটে

বোলতার চাক

ফেলেছে, মাথা ছিঁড়ে দিয়েছে, পাগুলো সমান করে কেটে দিয়েছে। শরীরের নরম অংশ চিবিয়ে চিবিয়ে আরো নরম করে বাচ্চাদের মুখের ওপর নামিয়ে দেয়। পাখির ছানার মতো বোলতার সন্তানরা ছোট্ট মুখগুলি পরম তৃপ্তির সঙ্গে মাংসের জুস খায়। বলকারী আর মুখরোচক

খাবার। গায়ে স্বাস্থ্যের ভাঁজ-পড়া মুখসর্বস্ব বাচ্চাগুলো বেড়ে উঠে লম্বায় কুঠুরির মুখের কাছাকাছি এলে সন্ন্যাসিনী সাদা চাদরেরর ঢাকনি দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। অন্য কুঠুরিতে ডিম পাড়া আর একটির পর আরেকটি কুঠুরি তৈরী করার কাজ চলতেই লাগলো।

অদৃশ্য যাদুকরের খেলা

চাদর ঢাকা দেওয়া কুঠুরিতে তখন কী ম্যাজিক হচ্ছে কে জানে! অনেক সময় মানুষ যাদুকর দর্শকদের যাদুর খেলা দেখায়। তাদের সামনে বাটিতে একটি ডিম রেখে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলো। অন্যান্য খেলা দেখানোর পর একটা কাঠি সাদা কাপড়ের উপর ছুঁইয়ে দিয়ে তুক্-তাক্ কি বলে খুব সন্তর্পণে ঢাকনা কাপড়টি তুলে নিল। দেখা গেল, বাটিতে ডিম নেই, বসে আছে একটি মুরগীর বাচ্চা। দর্শকরা আনন্দে হাততালি দিয়ে যাদুকরকে বাহবা দেয়। সন্ন্যাসিনী এর চেয়ে বড় যাদুকরী। কুঠুরির ঢাকনা কেটে দিলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে হলুদ পোষাক-পরা আর এক সন্ন্যাসিনী। ডানা, পা, মাথা সব পুষ্ট, ঠিক বয়স্ক যেন। মায়ের তখন কি আনন্দ! তার কাজে সঙ্গী পাওয়া গেছে। এরা কর্মী বোল্‌তা! চাকের ওপর ঘুরেফিরে কাজকর্ম দেখে। তারপর মায়ের সাহায্য করতে কাজে নেমে পড়ে। বাড়ি তৈরীর উপাদান আনে, খাবার আনে বোনেদের জন্যে। কর্মীরা তাদের তদারক করে, কুঠির গড়ে, শত্রু কাছে এলে তাকে শায়েস্তা করে।

দিন দিন সন্ন্যাসিনীর মঠ-উপনিবেশ বড় হয়ে ওঠে। সারাদিন সেখানে কাজের তৎপরতা। একদিন বাড়ির গাভীটা ঘাস খেতে রঙ্গনের বেড়ার কাছে গিয়ে পড়েছে, গাছে নাড়া লেগেছে। হঠাৎ গরুটা ভয় পেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ফাইটার বিমানের মত পাঁচ সাতটা হলুদ আক্রমণকারী ঝোপের ভিতর থেকে উড়ে এসে গরুর মাথার ওপর দিয়ে কয়েক চক্কোর দিয়ে ফিরে গেল। আক্রমণ ব্যর্থ হয় নি। অল্পক্ষণের মধ্যে গরুর চোখের পাতা ফুলে উঠলো। ওখানে হুল ফুটিয়েছে। খাপে ঢাকা ছোরার মত বোলতার লেজের দিকে ধারালো হুল লুকানো। তার গোড়ায় বিষের থলি। ছোরা চালিয়ে দিতেই একটুখানি বিষ চলে আসে তার সঙ্গে। আক্রান্ত স্থানে যন্ত্রণা সুরু হয়, ফুলে ওঠে। অসতর্কভাবে কাছে যাওয়ায় আসার মাথায় ও কাজের পিঠে আক্রমণকারী ছোরা চালিয়েছিল। মৌমাছির হুলের চেয়ে বোলতার হুলের যন্ত্রণা বেশি বলে মনে হয়েছে। এই অস্ত্রের ফলে সাহসী বোলতা তার চেয়ে লক্ষ গুণ বড় প্রাণীকে আক্রমণ করে হটিয়ে দিতে পারে। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাভীর চোখের পাতা ফুলে চোখ প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। কোথায় শূল বিঁধিয়ে দিলে শত্রুকে উচিত 'শিক্ষা' দেওয়া যায়, তা যেন ওদের জানা।

সংসারচক্র

মাস ছয়েকের মধ্যে ছোট্ট বোলতার চাক বড় এক খানা প্লেটের আকারে পরিণত হয়। তখন সব সময় দেখা যাবে হলুদ পোষাক-পরা কর্মীরা চাকের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে, কেউ বাচ্চাদের খাবার দিচ্ছে, কেউ কেউ নতুন কুঠুরি গেঁথে তুলছে, কেউ চাদর-ঢাকনি কেটে শাবকদের বন্ধ ঘর থেকে বাইরে টেনে তুলছে।

সন্ন্যাসিনী মাতা এ পর্যন্ত কেবল কর্মীদল সৃষ্টি করেছে। এবার কন্যা এবং কন্যার পাণিপ্রার্থী পুরুষদের সৃষ্টি করার পালা। কর্মীরা কিছুটা বড় ধরনের কুঠুরি বানায়। সেখানে সন্ন্যাসিনী যে ডিম পাড়ে তা থেকে উৎপন্ন হয় রাজকন্যা ও রাজপুত্রের দল। এরা সমাজে কোন কাজ করে না। কর্মীদের আনা মাংস খাবার খেয়ে বড় হয়ে পুরী ছেড়ে চলে যায়। ওদের স্বয়ম্বর হবে। তারপর শীত এসে পড়লে রাজকুমারীরা সন্তানসম্ভবা হয়ে তাদের মায়ের মতো কোন নির্জন গুহা বা নিরাপদ গর্তে ঘুমিয়ে শীতকালটা কাটিয়ে দেবে। বসন্তকালে বাইরে এসে নিজের উদ্যমে নতুন গৃহের পত্তন করবে।

বাণপ্রস্থ

এদিকে সন্ন্যাসিনীর জীবনের কাজ প্রায় সমাপ্ত। পুত্রকন্যারা ভবন ছেড়ে চলে গেছে। সেও একদিন বাণপ্রস্থে চলে যায়, আর বাড়িতে ফিরে আসে না। মহাপ্রস্থানের পথে আগুয়ান দ্রৌপদীর মতো পথেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কর্মীরা সংসারের কাজে উদাসীন হয়ে পড়ে। কেউ আর খাদ্য সংগ্রহ করতে যায় না। বাড়ি ঘর মেরামত করে না। গৃহত্যাগের বাসনা সকলের মনে প্রবল হয়ে ওঠে। তাদের কাণে যেন বিসর্জনের বাজনা বাজে। যে সন্তানরা আজও কুঠুরির মধ্যে খাবারের আশায় বসে রয়েছে, কর্মীরা তাদের একে একে টেনে তুলে বাইরে ফেলে দেয়। এবার সংসার ভাঙার পালা। তারপর শূন্য ভবনখানা পড়ে থাকে। কর্মীরা একের পর এক মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করে। সন্ন্যাসিনী আগেই গেছে। আগামী বছরে যে মেয়েরা নতুন করে রাজ্য গড়ে তুলবে, তারাও সাধনকুটিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

হলুদ সন্ন্যাসিনীর জীবনচক্র এমনি ধারায় কোন্ অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে যুগযুগান্ত ধরে চলে আসছে। সব সময় লোকের নজরে না পড়লেও তার মধ্যে ছন্দ আছে। নতুন জীবন আরম্ভ, তার সৃষ্টির পরিপূর্ণতা, তার বিলোপ। কিন্তু গোষ্ঠীর প্রাণের প্রবাহ শুকিয়ে যায় না। গাছ থেকে মাটিতে পড়া পাকা বীজ যেমন পরের বছর গজিয়ে ওঠে, এদের জীবনও তেমনি।

লেখনী, বারাসত, 24 পরগনা।

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা মার্চ '83 সংখ্যার দশ বা তার বেশ সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা—শৌভিক নন্দী, কৌশিক নন্দী, দিব্যেন্দু পাণিগ্রাহী, মিতা মণ্ডল, গৌতম, মণ্ডন, রমা মণ্ডল, মলয় দাশ, তন্দ্রা দাশ, প্রণবকুমার সরকার, সুপর্ণা সরকার, পল্লব দাসগুপ্ত, অলোক রায়চৌধুরী, অভিজিৎ সাহা, রাজীব নন্দী, কেয়া রায়চৌধুরী, পলি অধিকারী, সঞ্চিতা দাস, গৌতম দাস, সঞ্চয় কুণ্ডু, সমীর প্রামাণিক, স্নেহাশিস মৈত্র, গৌতম দাস, সুশীল ভট্টাচার্য, সৌমেন পাল, সুবীরকুমার দাস।

24-পরগণা—সুগত দত্ত, পিনাকীরঞ্জন দাস, সৌমিত্র মজুমদার, সৌমেন্দ্রনাথ মজুমদার, দীপা ঘোষ, মিতালি মুখার্জী, মমি পাল, লিপিকা পাল, মালা সরকার, বিপ্লবকুমার ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, জয়শ্রী বিশ্বাস, সৌমিত্র রায়, প্রদীপ সরকার, সমীরণ বিশ্বাস, চৈতালী ব্যানার্জী, এম ডি. আশরাফ আলী, শান্তনু ভট্টাচার্য।

হাওড়া—বামদেব চন্দ্র, তাপসকুমার রীত, অসিতকুমার রীত, অশোক নস্কর, ওঁকারনাথ মণ্ডল, শিল্পীশ্রী সেন, সেখ্ মহঃ উলফৎ, শেলী দাস, রীতা ভট্টাচার্য, কল্যাণকুমার পাত্র, হীরালাল সামন্ত, সুভাষ রায়চৌধুরী, ধুর্জটিপ্রসাদ সাহু, সৌমেন্দ্রনারায়ণ সরকার, শিপ্রা ভট্টাচার্য, হারুকুমার দাস, মানস রায়চৌধুরী, দেবাশিস ঘোষ, মৌসুমী খাঁ, পার্থ দাস।

হুগলী—মানব সাহা, সব্যসাচী চক্রবর্তী, এ. টি. এস. মোদাব্বের হোসেন, মৌলিনাথ ভট্টাচার্য, অংশুমান পাল, তন্ময় ব্যানার্জী, আশিসকুমার সাহা, কুনাল সেনগুপ্ত মাণিক সরকার, স্বপন মুখার্জী, তনুজা মুখার্জী, সমীরকুমার ব্যানার্জী, নেপালচন্দ্র মাল, সর্বেন্দু সিংহ, সোনা সিংহ, পলাশ মুখার্জী, শমিতা মল্লিক, নমিতা মল্লিক, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, অদিতি সিংহরায়, শুভ্রা দত্ত, দীপঙ্কর সাহা, সুব্রত দে।

বর্ধমান—বিশ্বরূপ সরকার, কৃষ্ণগোপাল সেন, দিলীপ গোস্বামী, সুধা সেন, শীলা সেন, চম্পা সেন, সুবীরকুমার পাল, কার্তিক মাথুর, সুপ্রিয় সামন্ত, মধুসূদন ঘোষ, শান্তনু দত্ত, শান্তনু তা, রানা রোম, সুনীতা গাড়িয়া, তড়িৎ ঘটক, আনন্দ কুণ্ডু, জয় মুখার্জী, মধুসূদন দত্ত, স্বপন পাল, সমর দাস, সনৎ দে, সেখ সামসুদ্দিন, দিব্যেন্দু গুহ, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, অরিজিৎ দাস, অভিজিৎ দাস, অশ্রুজিৎ দাস, তরুণকুমার সিংহ, অরুণকুমার সিংহ, বরুণকুমার সিংহ, নন্দিতা সিংহ, পুষ্পিতা মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৌমেন গাঙ্গুলী, সন্দীপ গাঙ্গুলী, উৎপল মণ্ডল, উজ্জল মণ্ডল, কাঞ্চন মুখার্জী, দুলাল দে, গৌতমকুমার বিট, সুরজিৎ কুণ্ডু।

মেদিনীপুর—অরবিন্দ সাউ, প্রকাশচন্দ্র বারিক বুদ্ধদেব মাহাতো, অনিল ঘোষ, অশোক দত্ত, তপন পাত্র, শুভংকর মাহাতো, সোনাতন মহাপাত্র, অমিতাভ সোম, সংঘমিত্রা সোম, সর্বানী ষড়ঙ্গী, দেবজ্যোতি ষড়ঙ্গী, দীপক ষড়ঙ্গী, ছন্দা ষড়ঙ্গী, শৈবাল বর্ধন, সাত্বিকপ্রসূন বেরা, গোপাল সিংহ, শান্তনু মাড়ক, বাসুদেব দত্ত, রঞ্জিত সিংহ, শুভাশীষ দে, মলয় দাশ, ননীগোপাল মণ্ডল, রঞ্জনকুমার শাসমল, স্বপনকুমার মাহাতো, মলয়কুমার মাহাতো, স্বদেশকুমার মাহাতো, অনন্ত ব্যানার্জী, লক্ষ্মীকান্ত ব্যানার্জী, শ্রীকান্ত ব্যানার্জী, গোষ্ঠ রাণা, অশীষকুমার বিশ্বাস, প্রকাশ সামন্ত, ভবেশচন্দ্র মাহাতো, কালীপদ গিরি, অলক চ্যাটার্জী, প্রভাতকুমার গিরি, রঞ্জনকুমার পানি, কঙ্কনকুমার পানি চন্দনকুমার পানি, ভুপেন্দ্রনাথ মাহাতো, ধরণীধর মাহাতো, অরুণাভ সোম, অরিজিৎ রাজ, অভিজিত রাজ, দেবাশীষ দাস, বিক্রমাদিত্য রাণা, তপরকুমার ধর, নীতা বিষ্ণু, বনমালী চট্টোপাধ্যায়, শক্তি ত্রিপাঠী, স্মৃতিকণা ত্রিপাঠী, উদয়শঙ্কর পাণ্ডা, আশিস পট্টনায়ক, সত্যব্রত জানা, মনোব্রত জানা।

নদীয়া—পল্লব মোহান্ত, মলয় মোহান্ত, শুভাশীষ মণ্ডল, শম্পা মণ্ডল, কাকলী দাস, সোমা দত্ত, দেবাশীষ কুণ্ডু পার্থ প্রতিম তরফদার, কিশোরকুমার বিশ্বাস।

বীরভূম সুমিত্রা দত্ত, রত্না দত্ত, গোপা বিশ্বাস, সুদীপ দত্ত, নীলকমল ব্যানার্জী, দীপনারায়ণ দত্ত, শম্পা সিন্‌হা, চন্দন সিন্‌হা, কাঞ্চন রায়, বিদ্যুৎ রায়, প্রদ্যুৎ রায়, প্রণব রায়, চিরঞ্জীব ঘোষ, রাহুল চক্রবর্তী, শরৎ গড়াই, অলোক আচার্য, অমিত নাগ, বাপ্পা নাগ, শম্পা সিন্‌হা, চন্দন সিন্‌হা।

বাঁকুড়া—গুরুদয়াল মিত্র, গুরুসদয় মিত্র, পিন্টু চার, গার্গী মিত্র, কল্পনা মিত্র, ধর্মরাজ অধিকারী, সৌমেন সেনগুপ্ত, মৌসুমী সেনগুপ্ত, সৌমেন মণ্ডল, রবীনকুমার মণ্ডল।

মুর্শিদাবাদ মোঃ গোলাম মোস্তাফা খান, কাজি জানে আলম, পারভেজ জামান, মারিয়া সুলতানা, সামসাদ নাজনীন, ইয়াসমিন নেগার, বশীরউদ্দিন, হাসিনা মাহাবুব, পলাশ মোহান্ত, বিকাশ মোহান্ত, মানস মোহান্ত, চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, শুভাশিষ মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু রায়, সমীর সরকার, পার্থ সান্যাল, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, কৌস্তব সান্যাল, মুক্তিপদ দাস। বিবেকানন্দ সরকার, পল্লব চ্যাটার্জী, নীলিমা চ্যাটার্জী।

মালদা—নীনা মল্লিক, সরিৎকুমার দাস, সুরজিৎ পাল, কল্লোল মকুমদার, সঞ্জীব দে, দেবব্রত রায়, অনামিকা রায়।

জলপাইগুড়ি—জয়জিৎ লাহিড়ী।

পুরুলিয়া তপন গোপ, ধরণী বাউরী, উত্তম গোপ, জয়দব মাহাতো, সুদীপ ব্যানার্জী।

বিহার ঃ ধানবাদ—স্বপনকুমার রায়, সৌমেন্দ্রনাথ নন্দী।

প্রশ্নোত্তর

1. প্রঃ—ম্যাগডেবর্গ পরীক্ষার অনুরূপ কোনো বায়ুশূন্য গোলক বায়ুশূন্য ঘরে রেখে খোলবার চেষ্টা করলে গোলকটি খুলবে কি ?

কাজল ভট্টাচার্য, দমদম রোড, কলকাতা-2

উঃ খুলবে, যদি ঘরটি সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য থাকে। কারণ তখন গোলকের ভেতরে ও বাইরে বায়ুর চাপ বলতে কিছু থাকবে না।

2. সাগরের জল নোনতা কেন ?

পার্থপ্রতিম তরফদার, শোনঘাটা, নদীয়া।

উঃ—সমুদ্রের জলে সাধারণ লবণ (NaCl) দ্রবীভূত থাকে বলে নোনতা হয়।

3. প্রঃ—সূর্য যে মহাশূন্যে ঘুরছে তাতে কি এক জায়গায় স্থির থেকে ঘুরছে, না স্থান পরিবর্তন করে ?

ডি. কে চ্যাটার্জি, আদ্রাহাটি, বর্ধমান।

উঃ—সূর্য মহাশূন্যে স্থান পরিবর্তন করেই ঘুরছে, এক জায়গায় স্থির হয়ে ঘোরে না।

4. সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় আমরা সূর্যকে লাল দেখি কেন ?

দেবাশিস কর, জামশেদপুর—3, বিহার।

উঃ উদয় বা অস্তের সময় সূর্য দিকচক্র কাল নিচে চলে যায়। তার ফলে সূর্যের নীল আলোকরশ্মি তখন বাতাসের ধূলিজাল ও জলকণা ভেদ করে আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয় না ; কিন্তু লাল রঙের আলোকরশ্মি চোখে পড়ে। তাই সূর্যকে তখন লাল দেখায়। সূর্য রশ্মির ভেতরে সাতটা রঙ যে আছে তা তো জানাই আছে।

5. প্রঃ—হেঁচকি ওঠে কেন ? হেঁচকি উঠলে অনেকে জল খেতে উপদেশ দেন কেন ?

পলাশ মোহান্ত, মুর্শিদাবাদ।

রাজা হালদার, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া।

উঃ—হেঁচকি ওঠার কারণ অস্বাভাবিক আক্ষেপ। ঐ আক্ষেপের ফলে ফুসফুস থেকে আচমকা অত্যধিক বায়ু বেরিয়ে আসে। তার দরুন কণ্ঠনালী থেকে একপ্রকার শব্দ হয়। জল পান করলে আক্ষেপ বন্ধ হওয়ার সহায়তা হয়। সে কারণে অনেকে জল পান করতে বলেন।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

অমরনাথ রায়

1. ফিউজের তার কি বৈদ্যুতিক হিটারের তার হিসবে ব্যবহার করা যাবে ?

2. 1959 খ্রীষ্টাব্দে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে ?

3. 'ক্রোমোজোম' কি ?

4. কোন্ গ্যাস দাহ্য নয়, দহনের সহায়ক নয়, বিষাক্ত নয় এবং শ্বাসকার্যে সহায়তা করে না ?

5. মাংস, ফুল ও ফলকে তরল বায়ুর সংস্পর্শে আনলে কি হয় ?

6. তামাক পাতার রোগ সংক্রমণকারী 'টোবাকো মোজেইক ভাইরাসে' D. N. A. আছে কি ? না থাকলে, কি আছে ?

7. কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস জলে দ্রাব্য না হলে কি ক্ষতি হত ?

8. পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মূত্রে কোন্ হরমোন থাকে ?

9. বর্ষাকালের আকাশে কোন্ শ্রেণীর মেঘ দেখা যায় ?

10. 'অ্যালনিকো' কি জিনিস ?

11. ড্রাই-আইসের উষ্ণতা কত ?

12. আলোর গতিবেগ ঘনতর মাধ্যমে বেশি, না লঘুতর মাধ্যমে বেশি ?

13. 'স্পার্ম-হোয়েল' নামক তিমির অন্ত্র থেকে যে সুগন্ধি নিঃসৃত হয়, তার নাম কি ?

14. ভারতের প্রথম পরমাণু রিয়্যাক্টর-এর নাম কি ?

15. কোন্ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ উদ্বৃত্ত জল ত্যাগ করে ?

(উত্তর পরবর্তী সংখ্যায়)

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা : মার্চ 83 সংখ্যার উত্তর

1. ফটো সেল' এমন এক বস্তু, যা আলোকশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে। 2. অ্যামোনিয়া গ্যাসের। 3. 537 ক্যালোরি প্রতি গ্রাম। 4. ভিটামিন-সি 5. লেকলান্স সেল (Leclanche cell)। 6 কালো। 7. বুঝতে হবে ঝড় আসছে। 8. নরম লোহা দিয়ে। 9. মরীচিকা। 10. 'পাই' বলা হয়। 11, ভিটামিন-সি থাকে না। 12. জলের তলায়। 13. না। 14. চরম উষ্ণতার স্কেলের বা কেলভিন স্কেলের। 15. সুবিধা অনেক বেশি হবে।

—০—

বিজ্ঞানের শব্দকূট

দেবাশিস কর

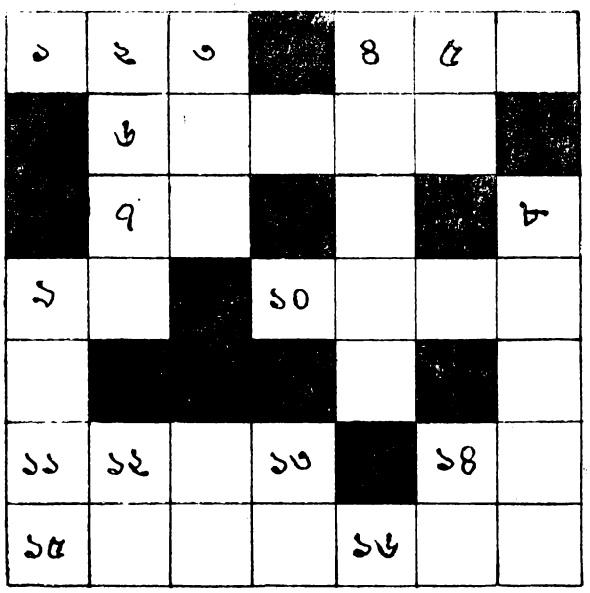

পাশাপাশি ঃ

1. মাতৃ-গর্ভস্থ ভ্রূণ জরায়ুতে যে কলার সাহায্য করে ; অস্থায়ীভাবে যুক্ত থাকে এবং মায়ের শরীর থেকে পুষ্টিরস সংগ্রহে সাহায্য করে ; 4 পরাগ সংযোগ ব্যতীত বীজহীন ফল উৎপন্ন করতে এই উদ্ভিদেও অক্সিন ব্যবহার করা হয় ; 6 আলোকের ওয়েভ থিয়োরী যাঁর যুগান্তকর আবিষ্কার ; 7 জীবাণু তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে 1905 খৃষ্টাব্দে যিনি নোবেল পুরস্কার পান ; 9 সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে এর পুরোটাই কাবার হয় পৃথিবীর ; 10 লালাগ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইম, স্টার্চ বা কার্বোহাইড্রেটের ওপর কাজ করে ডেক্সট্রিন ও মল্টোজে পরিণত করে ; 11 পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরে, যার কোন কূলকিনারা নেই ; 14 তড়িৎ বিভব ও বিভব পার্থক্যের ব্যবহারিক একক ; 15 একক ভরের কোন পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন করতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োগ বা নিষ্কাশন করতে হয় ; 16 একটি ত্রিযোজী মৌল।

উপর নিচ ঃ

2. বিশ্বের যে-কোন দুটি কণা তাদের সংযোজী রেখা বরাবর পরস্পরকে আকর্ষণ করে যে ধর্মের প্রভাবে, 3. জার্মান পদার্থবিদ, ইণ্ডিয়াম মৌলের (রিখটারের সঙ্গে এককে) আবিষ্কর্তা (1863 খৃঃ) ; 4 যে মৌলের পরমাণু ক্রমাঙ্ক 38 ; 5 ধাতব মৌলের অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড ; 8‘ 1808 খৃষ্টাব্দে যাঁর বিখ্যাত পরমাণু-বাদ প্রকাশিত হয় , 9 একটি সুন্দর পরীক্ষার সাহায্যে গলনাঙ্কের ওপর চাপের প্রভাব দেখান ইনি ; 12 1917 খৃষ্টাব্দে মাইটনারের সঙ্গে যিনি যুগ্মভাবে প্রোট্যাকটি-নিয়ম মৌল আবিষ্কার করেন ; 13 1860 খৃষ্টাব্দে যে দু'জন জার্মান উদ্ভিদবিদ জলকৃষ্টির পরীক্ষার সাহায্যে উদ্ভিদদেহে ম্যাক্রো এলিমেণ্ট ও মাইক্রো এলিমেণ্টের গুরুত্ব প্রকাশ করেন, তাঁদের একজন ; 14 সূর্য দিগন্ত রেখার নিচে থাকে, তবুও এসময়ে সূর্যালোক দেখা যায়।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

ঠাকুরবাটী স্ট্রীট, বল্লভপুর, শ্রীরামপুর

একটি বৈদ্যুতিক মডেল

দেশকল্যাণ চৌধুরী

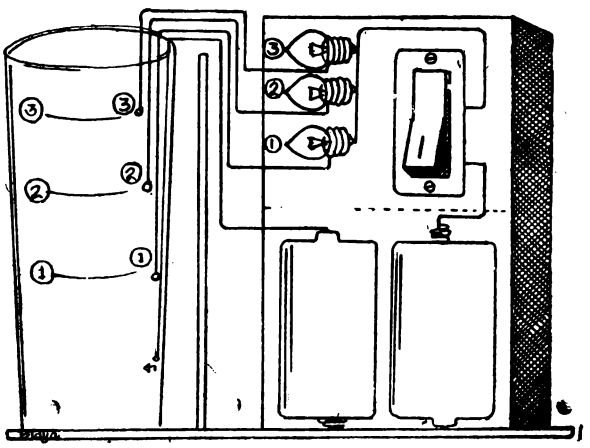

আজ এমন একটি বৈদ্যুতিক মডেল নিয়ে আলোচনা করবো, যার দ্বারা আমরা একটা নির্দিষ্ট স্থানের জলতল বাড়া কমা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে পারব। অবশ্যই সামনাসামনি দেখে নয়, অনেক দুরে থেকে। প্রথমে বলি মডেলটার জন্যে কি কি জিনিস প্রয়োজন।

1. একটা কাঁচের পাত্র 2. একটা কাপ বা মগ যার মুখটা ছুঁচলো। 3. তিনটে টুনি লাইট (টর্চের) 4. দুটো ব্যাটারী 5. একটা সুইচ। 6. একটা কাঠের বাক্স, কিছুটা তার ইত্যাদি।

প্রথমে কাঁচের পাত্রটার গায়ে ছবির মতো করে তিনটে দাগ দেওয়া হলো। কাজের সুবিধার জন্যে এগুলোর একটা করে নাম দাও। ধরা 1নং 2নং আর 3নং। এবার কাঠের যে বাক্সটা আছে তার এক পাশে তিনটে বালব পর পর বসিয়ে দাও। এদেরও নাম দাও 1, 2 এবং 3নং। আলো তিনটের অন্যপাশে একটা সুইচ আর নিচে ব্যাটারী দুটো বসিয়ে দাও। এখন একটা কাঠিকে পাত্রটার গায়ে আটকে দিয়ে, তার শেষ প্রান্তে একটা তার (ক), একটু উপরে 1নং 2নং 3নং দাগের সমান্তরাল উচ্চতায় 1, 2, 3নং তার আটকে দাও। এবারে কোন্ তারটা কোথায় আটকাব দেখে নাও।

ক তারটি আটকে দাও ব্যাটারী ধনাত্মক প্রান্তে।
1 নং " " " 1নং বালবের এক প্রান্তে।
2 নং " " " 2নং " " "
3 নং " " " 3নং " " "

তারপর তিনটে বালবেরই অপর প্রান্ত তিনটি আটকে দাও এক সঙ্গে সুইচের এক প্রান্তে এবং সুইচের অপর প্রান্তের তারটা জুড়ে দাও ব্যাটারীর ঋণাত্মক প্রান্তে। ব্যাস, তৈরীর কাজ শেষ।

মডেলটাকে এবারে পরীক্ষা করা যাক। প্রথমে মগে করে কিছুটা জল নিয়ে সেই জল কাঁচের পাত্রটায় ফেলতে থাক। (এর আগে অবশ্য সুইচটাকে অন করে দিতে হবে)। দেখবে জলতল যেই 1নং দাগ স্পর্শ করবে সঙ্গে সঙ্গে 1 নং আলোটা জ্বলে উঠবে। এমনি করে জলতল 2 নং এবং 3 নং দাগ স্পর্শ করা মাত্রই 2নং এবং 3নং আলো দুটো পর পর জ্বলে উঠবে।

38, মথুরবাবু লেন, কলিকাতা-700015

ভেবে ভেবে বল

শুভব্রত রায় চৌধুরী

1. এক চাষীর একটি বর্গাকার জমি ছিল। তিনি সেই জমিটি তাঁর চার ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইলেন, নিজের এক টুকরো জমি হাতে রেখে। নিজের জমির ভাগটি ছিল সম্পূর্ণ জমির একের চার ভাগ। এই জমিটি তাঁকে এমনভাবে ভাগ করে দিতে হবে, যাতে প্রতিটি ছেলে সমান সমান ভাগ পায়।

2. ছবিটা দেখে মনে হচ্ছে, একটা তিমি মাছের মুখ। কোন্ প্রজাতির তিমি মাছ তার নামটা ভেবে বলো।

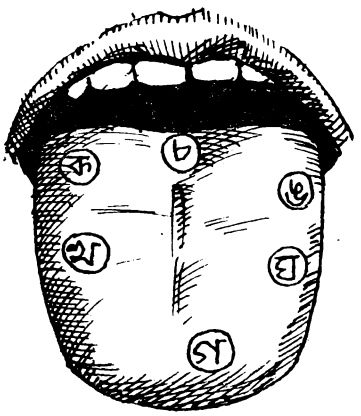

3. ছবিতে জিভের বিভিন্ন অংশগুলোর (ক)—(চ) চিহ্নগুলো জিভের নানাপ্রকার স্বাদকে বোঝায়। সেগুলো ভেবে বলো।

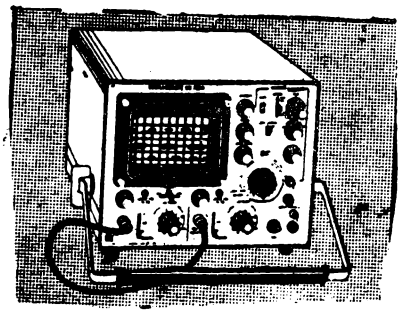

4. ছবিতে একটি যন্ত্র দেখানো হয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির পরীক্ষা করা হয়। ল্যাবরেটরীতে প্রায় আমরা যন্ত্রটিকে দেখি। যন্ত্রটির নাম জানো কি?

5. একটি সবজি শীতকালে বেশি পাওয়া যায়, যাতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো আছে, সবজিটির নাম কি?

জল	ঃ	89·4 %
প্রোটিন	ঃ	5·3 %
স্নেহপদার্থ	ঃ	0·4 %
শর্করা	ঃ	5·3 %
খনিজ	ঃ	1·4 %
ক্যালসিয়াম	ঃ	0·03 %
ফসফরাস	ঃ	0·06 %

6. এরোপ্লেনে বসবার প্রধান কক্ষটির নাম বলো?
(i) মিডলেজ (ii) মিওসিলেজ, (iii) কাটিপ্লেজ

উত্তর ঃ

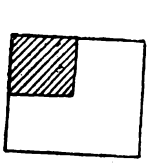

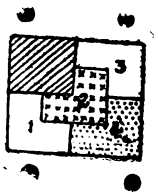

1. 2. নীল তিমি 3. (ক) টক (খ) নোনতা (গ) মিষ্টি (ঘ) নোনতা (ঙ) টক (চ) তেঁতো। 4. অসিলোসকোপ 5. ফুলকপি ৬. মিওসিলেজ।

ভাবনা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

আলজিভ

মুখগহ্বরের পিছনে নরম তালুর মধ্যাংশ থেকে ঝিল্লি দ্বারা আবৃত যে ক্ষুদ্র পেশীপিণ্ডটি ঝুলে থাকে সেটি আলজিভ বা আলজিহ্বা নামে পরিচিত। নরম তালু বা টাকরা হলো একটি পেশীকলার ভাঁজ যা নাড়ানো যায়। শক্ত তালু বা টাকরা এবং নরম তালু একসঙ্গে মুখগহ্বরের উপরের অংশ বা ছাদ তৈরী করেছে।

সময়বিশেষে গলদেশ শিথিল অথবা সংক্রামিত হলে, আলজিভ্ বেড়ে গেলেও এটি কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। গলার অবস্থার উন্নতি হ'লে এটি স্বাভাবিক আকার ফিরে পায়।

কোন কোন প্রাণী যাদের কাছে ঘ্রাণের অনুভূতি গুরুত্বপূর্ণ তাদের ক্ষেত্রে স্বরযন্ত্রের প্রবেশমুখ এবং জিহ্বার ঠিক সংযোগ-স্থলে অবস্থিত একটি পত্রাকার তরুণাস্থিখণ্ডের সঙ্গে আল্-জিভটি যুক্ত থাকে। এর ফলে প্রাণীটিকে সর্বদা নাক দিয়ে শ্বাসের কাজ চালাতে হয়। মানুষের ক্ষেত্রে আলজিভ এবং তরুণাস্থিখণ্ডের মধ্যে একটি ফাঁক থাকে, যার মধ্য দিয়ে দুর্ঘটনাক্রমে স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলের ভিতর খাদ্য ঢুকে প্রবল অস্বস্তির সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

অনুঘটক

অনুঘটক হচ্ছে এমন একটি পদার্থ যা কোন একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সরাসরি অংশ গ্রহণ না করেও বিক্রিয়া-টিকে প্রভাবিত করে। শিল্পক্ষেত্রে বহু প্রক্রিয়া অনুঘটকের উপর নির্ভরশীল।

অনুঘটকের একটি সহজ উদাহরণ হচ্ছে যখন অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন প্লাটিনামের উপস্থিতিতে দ্রুত পরস্পরের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে প্লাটিনাম্ অনুঘটকের কাজ করে। অনুমান করা হয় যে, ধাতবপৃষ্ঠে বিক্রিয়াকারী গ্যাসগুলি শোষিত হওয়ার ফলে এদের মধ্যে বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

ব্রোঞ্জ, পিতল প্রভৃতি সংকর-ধাতুর প্রস্তুতির সময় অবাঞ্ছিত গন্ধক এবং অক্সাইডগুলিকে তাড়াবার জন্যে অনুঘটক হিসাবে ম্যাগ্নেসিয়াম ব্যবহার করা হয়।

মানবদেহের মধ্যেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অনুঘটকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হলো জৈব অনুঘটক, যেগুলি উৎসেচক নামে পরিচিত। দেহের তাপমাত্রায় এগুলি শর্করার দহনের মতো রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি ঘটায়। পরীক্ষাগারে ঐ উৎসেচকগুলির অনুপস্থিতিতে এই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে যে উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়, তাতে যে কোনরকম প্রাণের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

জানা-অজানা

স্বপনকুমার মজুমদার

1, কোনো জাহাজের রঙ যদি কালো হয় এবং জাহাজটি যদি কোনো উষ্ণ অঞ্চলে আসে, তা হলে জাহাজের খোলের তাপমাত্রা 10°C বেড়ে যায়। যদি জাহাজটির গায়ে সাদা রঙ থাকত তবে এই দশ ডিগ্রী বাড়ত না।

2, আগে পিতল বা কাঁসার বাসনের খুব চল ছিল। এখন যে জায়গা দখল করে বসছে স্টেনলেশ স্টীল। দেখতে যেমন ঝকঝকে, ধোয়ামোছাও খুব সহজ। তবে সস্তা লোহার উপর ক্রোমিয়াম ধাতুর প্লেটিং করলে এক দম স্টেনলেশ স্টীল মনে হবে। অনেকে এইরকম স্টীল কিনে বোকা বলে যান। চেনবার সহজ উপায় হলো, যদি একটি চুম্বক স্টেনলে স্টীলের বাসনে ঠেকানো হয় তবে তা আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু স্টীল না হলেই আকর্ষণ করবে।

3, আমরা জানি, বাজপড়ার শব্দ ভীষণ জোরে হয়। এর কারণ হলো বিদ্যুতের তাপে বাতাস হঠাৎ প্রসারিত হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সংকুচিত হয়। এর ফলে বাতাসে তীব্র আন্দোলন হয় এবং শব্দ জোরে হয়।

4, সুইডেনে খবরের কাগজের মতো খবরের টেপ প্রতিদিন সকালবেলা বিলি করে হকাররা। তারপর ঐ টেপ টেপরেকডারে চালিয়ে দিলেই খবর শুরু হয়ে যায়। এক একটা টেপ 60 মিনিট চলে। এতে মাসিক খচর পড়ে 125 টাকা, সেই সঙ্গে টেপও ফেরৎ দিতে হয়।

5, অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে পায়রাকে ছেড়ে দিলে সে ফিরে আসে। কারণ পৃথিবীর চুম্বক-আকর্ষণ তাকে পথের নিশানা দেয়। যদি পায়রার ডানায় ছোট চুম্বক বেঁধে দেওয়া যায়, তা হলে পায়রা পথ হারিয়ে ফেলবে। কারণ পৃথিবীর চুম্বকশক্তি ডানায় চুম্বকের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যাবে।

6. ন্যাপথলিন ক্রিয়োজেট ও কুইনোলিন বলে দুটি জিনিস আছে। এই দুইটিই তীব্র অ্যানটিসেপটিক জিনিস। এর গন্ধে এবং স্পর্শে কাপড়-কাটা পোকার প্রাণহানি হয় বলে তারা কাছে আসে না এবং কাপড় কাটতে পারে না।

শিবাজী রোড, দুর্গাপুর-4, বর্ধমান

আমরা সবরকম বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম...

নানা জল্পনা কল্পনা, নানারকম নৈরাশ্যজনক ভবিষ্যতবাণীকে ব্যর্থ প্রমাণ করে ভারতে নবম এশিয়ান গেমস-এর এই বিপুল সাফল্য কি ক'রে সম্ভব হলো?

"সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং শৃঙ্খলাবোধের সঙ্গে
কঠোর পরিশ্রম"-এর ফলে।
এই স্মরণীয় উদ্ধৃতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর।
নতুন ২০ দফা কার্যসূচী উদ্বোধনের সময়
তিনি এই আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই মনোভাব নিয়ে মিলেমিশে কাজ ক'রে আমরা রেকর্ড সময়ে বিশাল স্টেডিয়ামগুলি তৈরী করেছি এবং দক্ষতার সঙ্গে খেলার আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি। এশিয়াডের জন্য আমরা যা করেছি আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং নতুন ২০ দফা কার্যসূচীর জন্যেও আমরা তা করতে পারি।

শক্তিশালী দেশ গঠনে
আসুন আমরা সকলে মিলেমিশে কাজ করি

davp 82/559

হারুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

জোয়ারের জল বাড়তেই চাঙ্গা হয়ে উঠল নটিলাস। বিপদ-জনক টেরেস প্রণালী দিয়ে আবার শুরু হল তার যাত্রা।

কেপ ওয়েসেল অতিক্রম করে টিমরের সাগর হয়ে নটিলাস ভারত মহাসাগরের দিকে যাত্রা করল।

দেখুন স্যার, কী সুন্দর। মনে হচ্ছে আমরা যেন গলিত সীসের ভিতর দিয়ে চলেছি।

আলোটা আসছে এক ধরণের অতি ক্ষুদ্র পোকার শরীর থেকে। এই পোকাগুলো দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়।

ডাক্তারি বিদ্যা আপনার কি কিছু জানা আছে প্রফেসর?

অল্প-স্বল্প।

তাহলে অনুগ্রহ করে আমার সাথে আসুন। একজন নাবিককে পরীক্ষা করতে হবে।

নাবিকটির দেহে ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন অ্যারোনেক্স

সর্বনাশ! মাথায় যে একটা মাংঘাতিক ক্ষত! এমন চোট কীভাবে লাগল ক্যাপ্টেন?

আপনার যা বলার বলুন প্রফেসর। লোকটি ফরাসী জানে না।

ক্যাপ্টেন দেখছি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ইনি মারা যাবেন।

বাঁচানো যাবেনা?

আই অ্যাম সরি ক্যাপ্টেন।

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 2nd year • April 1983 Regd No WBCC/50

উপহার ও পাঠাগারের বই

কিশোর ক্ল্যাসিক্স

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর
- ক্ষীরের পুতুল ১৫-০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ছোটদের কাশীনাথ ৬-০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- কিশোর অপু ১৫-০০
- অপুর ছেলেবেলা ৬-০০
- ছোটদের অপরাজিত ৬-০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
- ছোটদের কাজল ৬-০০

বুদ্ধদেব বসু
- অপরূপ রূপকথা ১০-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত
- বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ১০-০০
- মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ৮-০০
- আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪-০০
- বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ৪-০০
- পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা ৪-০০

সমরজিৎ কর
- নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত
- আলো আরও আলো ১৫-০০
- রোমাঞ্চকর রসায়ন ১২-০০

নতুন বই ! ছবির বই !! খেলার বই

সিদ্ধার্থ ঘোষ

অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ৮·০০

বাক্সের মধ্যে বই ও এক বাক্স খেলার সরঞ্জাম

ছবি ও ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
- খুকুমনির ছড়া ১০-০০
- রাঙা ছবি ৩-০০

অন্নদাশঙ্কর রায়
- হট্টমালার দেশে ৫-০০

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- ঘনাদার জুড়ি নেই ৫-০০
- মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ৫-০০
- ঘনাদা বিচিত্রা ১২-০০

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়
- টেনিদার অভিযান ১৫-০০
- চারমূর্তি ৫-০০
- ঝাউবাংলোর রহস্য ৫-০০
- কম্বল নিরুদ্দেশ ৫-০০

ফ্যান্টাসী, রহস্য ও অভিযান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- সুন্দরবনে সাত বৎসর ৫-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- হাতিচোর ৬-০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা ১০-০০
- রামধনু ৬-০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
- কায়াহীনের কবলে ৪-০০
- হট যাও হার্মাদ ৫-০০

ধীরেন্দ্রনাথ ধর
- দুরন্ত যাত্রী ৫-০০

কোনান ডয়েল
- শার্লক হোমসের কিশোর গোয়েন্দা গল্প ৭-০০
- শার্লক হোমসের কিশোর রহস্য গল্প ৭-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা–৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রচ্ছদমুদ্রণ রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২